এহইয়াউ উলুমিদ্দীন

(চতুর্থ খণ্ড)

মূল ঃ

হুজ্জাতুল ইসলাম

ইমাম গায্যালী (রহঃ)

অনুবাদ

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদকঃ মাসিক মদীনা

সহযোগিতায় ঃ মাওলানা আবদুল আজীজ (রহঃ)

মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শাখা : ৫৫/বি. পুরানা পল্টন (দোতালা), ঢাকা-১০০০

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতে ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গায্যালীর (রহঃ) (৪৫০হিঃ—৫০৫ হিঃ) রচিত অমর গ্রন্থ "এহইয়াউ উলুমিদ্দীন"-এর চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ পাঠকগণের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে। প্রায় নয় শ' বছর আগে এ মহান গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এটি একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থরূপে সমগ্র বিশ্বে সমভাবে পঠিত ও সমাদৃত। মানব রচিত দুনিয়ার আর কোন গ্রন্থ এরূপ সমাদৃত হওয়ার নযীর আছে কি না, তা আমাদের জানা নেই। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক ও দার্শনিক ইমাম গায্যালী (রাঃ) মহান আল্লাহর নিকট কতটুকু মকবুলিয়ত অর্জন করেছিলেন, তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলোই তা প্রমাণ করে। এ মহান সাধক সম্পর্কে অনেক মনীষীরই মন্তব্য হচ্ছে যে, ইমাম গাযযালী (রহঃ) হচ্ছেন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি আশ্চর্য মু'জেযা বিশেষ। আল্লাহর প্রিয় হাবীবের উম্মত যাতে গোমরাহ না হয়, সেজন্য আল্লাহ পাক যুগে যুগেই অসাধারণ মেধাসম্পন্ন যেসব লোক সৃষ্টি করবেন বলে হাদীস শরীফে সুসংবাদ রয়েছে, ইমাম গাযযালী (রহঃ) ছিলেন তারই অন্যতম বাস্তব নমুনা।

'এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন' অর্থ ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানের নবজীবন দান। কিতাবখানি তার নামের কতটুকু সার্থকতা দান করেছে, সেকথা ব্যাখ্যার মোটেও প্রয়োজন করে না।

'এহইয়ার' অনেকগুলো ব্যাখ্যা গ্রন্থ এবং পৃথিবীর বহু ভাষায় এর অনুবাদ-টীকা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। এক শ্রেণীর স্থূলবুদ্ধির লোক অবশ্য এ মহান গ্রন্থের সমালোচনাও করেছে। তাদের অভিযোগ হচ্ছে, ইমাম সাহেব এ গ্রন্থে যে অসংখ্য হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, এগুলো কোন্

কিতাব থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন, তা যেমন লিখেননি, তেমনি কোন সনদ বা বর্ণনাসূত্রও উল্লেখ করেন নি। ফলে, হাদীসগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রকাশভঙ্গী ওয়ায়েজসুলভ, তাঁর আগে কেউ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে এরূপ ধারা অবলম্বন করেননি। যার ফলে তাঁর বক্তব্য অনেকটা গাম্ভীর্য হারিয়েছে। বলা বাহুল্য, এসব অভিযোগ একেবারেই অর্থহীন। কারণ, গাযযালী (রহঃ) নিজেই ছিলেন একজন স্বীকৃত ইমাম। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব সনদসূত্র ছিল। তাঁর উস্তাদ ইমামুল হারামাইন আল্লামা জোয়াইনী (রহঃ) থেকে শুরু করে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত সে সূত্রটি ছিল এতই প্রসিদ্ধ যে, প্রতিটি হাদীসের সাথে সে বর্ণনা সূত্র উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

দ্বিতীয়ত, বর্ণনাভঙ্গীর ক্ষেত্রে ইমাম গায্‌যালী (রহঃ) যে অনন্য রীতিটি অবলম্বন করেছেন এটা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। পূর্ববর্তী রচনাশৈলীর সাথে এর মিল না থাকাটা বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কিত নয় নিশ্চয়ই।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম গায্‌যালীর (রহঃ) পুস্তক পৃথিবীর সব কয়টি উল্লেখযোগ্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এহইয়াউ উলুমিদ্দীন গ্রন্থটিরও পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক অনুবাদ দুনিয়ার সর্বত্রই রয়েছে। বাংলা ভাষায় এহইয়ার অনুবাদ ইতিপূর্বেই হয়েছে। তারপরও আমি কেন পুনরায় এ মহাগ্রন্থটি অনুবাদে হাত দিলাম, সে কৈফিয়ত দিতে চাই না। বিজ্ঞ পাঠকগণই তা অনুভব করতে পারবেন। তাছাড়া, মুসলিম জনগণের নিত্যপাঠ্য এ মহাগ্রন্থটির প্রচার-প্রসার যত বেশী হয়, ততই সেটা কল্যাণকর বলে আমার ধারণা।

অনুবাদ যথাসাধ্য মূলানুগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কতটুকু সফল হয়েছি, সে বিচারও পাঠকগণই করবেন।

আল্লাহর রহমতে গ্রন্থটির চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হলো। অবশিষ্ট খণ্ডগুলোর কাজও চলছে। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই সেগুলোও পাঠকগণের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হবে।

দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাজনিত কারণে আমি নিজে প্রুফ সংশোধন করতে পারি না। তাছাড়া, আমার শক্তিও তো নিতান্তই সীমাবদ্ধ। সুতরাং অনুবাদ বা মুদ্রণে ভুল-ত্রুটি থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিজ্ঞজনদের প্রতি বিনীত অনুরোধ, যে কোন ধরনের ত্রুটি ধরা পড়লে দরদের সাথে জানিয়ে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার সুযোগ অবশ্যই দিবেন। এতদসঙ্গে সকলের দোয়া চাই, আল্লাহ পাক যেন অনুগ্রহ করে অবশিষ্ট খণ্ডগুলোও দ্রুত সমাপ্ত করার তাওফীক দান করেন।

বিনীত

মুহিউদ্দীন খান

মাসিক মদীনা কার্যালয়, ঢাকা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

যশ ও রিয়া

হাদীস শরীফে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ أَخْوَفَ عَلَىٰ أُمَّتِى الرِّيَاءُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ -

অর্থাৎ আমার উম্মতের জন্যে আমি যেসব বিষয়ের আশংকা করি, তন্মধ্যে সর্বাধিক ভয়াবহ বিষয় হল রিয়া ও গোপন খাহেশ। অন্ধকার রাত্রিতে শক্ত পাথরের উপর কাল পিপীলিকা চলাচল করলে যেমন তা কিছুতেই টের পাওয়া যায় না, তেমনি এ গোপন খাহেশও অনুভূত হয় না। একারণেই এর বিপদ সম্পর্কে বড় বড় আলেমগণও জানতে পারেন না। যেনতেন আবেদ ও মুত্তাকীদের তো কথাই নেই। এটা নফসের বিনাশকারী শক্তি ও গোপন প্রতারণা। যেসকল আলেম ও আবেদ আখেরাতের পথ অতিক্রম করতে চায় এবং তজ্জন্যে খুব তৎপর হয়, তাদেরকে রিয়ায় লিপ্ত করা হয়। অর্থাৎ, তারা নিজের নফসকে মুজাহাদা ও সাধনার মাধ্যমে পরাভূত করে কামনা-বাসনা থেকে আলাদা করে নেয় এবং সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি থেকে বাঁচিয়ে নেয়। এরপর নফসকে বলপূর্বক বিভিন্ন প্রকার এবাদতে মশগুল করে। ফলে, তাদের নফস বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কোন বাহ্যিক গোনাহ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। নফস যখন মুজাহাদার পরিশ্রম থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় দেখে না, তখন এ পরিশ্রমের বিনিময়ে শান্তি, স্বস্তি ও আরামের অভিলাষী হয়। দুনিয়ার মানুষ যখন তাদেরকে মানতে এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শুরু করে, তখন নফস এক প্রকার আনন্দ অনুভব করে। এরপর তারা এলম, আমল ও এবাদত প্রকাশ করতে উৎসাহিত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা ভাল বলবেন কেবল এতেই তারা সবর করতে পারে না। তারা দেখে, মানুষের মধ্যে খ্যাত হয়ে গেছে অমুক ব্যক্তি কামনা-বাসনা বর্জনকারী, সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষাকারী এবং কঠোর এবাদতের শ্রম স্বীকারকারী।

তারা আরও দেখে, অনেক মানুষ তাদের তারীফ ও প্রশংসা করে, তাদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তাদের সাক্ষাতকে বরকত মনে করে, তাদের থেকে দোয়া নিতে আগ্রহী হয়, দেখামাত্রই প্রথমে সালাম করে, মজলিসের কেন্দ্রস্থলে আসন দেয়, সম্মুখে বিনীত ও নম্র হয়ে থাকে এবং খেদমত ও অন্য কোন মতলবের কথা বললে তা করতে তৎপর হয়ে যায়। এ সব দেখে-শুনে তাদের নফস এমন আনন্দ পায়, যার উপরে কোন আনন্দ নেই। এ আনন্দের আতিশয্যে গোনাহ বর্জন করা তেমন কঠিন হয় না এবং অব্যাহতভাবে এবাদত করা খুব সহজ হয়ে যায়। তারা তো মনে করে যে, তাদের জীবন আল্লাহর জন্যে এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এবাদতের জন্যে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবন সেসব কামনা-বাসনা ও আনন্দের প্রত্যাশী হয়ে থাকে, যা সুস্থ বিবেক ছাড়া কেউ জানে না। মানুষের সম্মান প্রদর্শনের কারণে যে আনন্দ তাদের অর্জিত হয়, তার দরুন এবাদত ও আমলের সমস্ত সওয়াব বরবাদ হয়ে যায়। তারা তো নিজেদেরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল মনে করে; কিন্তু বাস্তবে তাদের নাম মুনাফিকদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়। সুতরাং এটা নফসের এমন এক প্রতারণা, যা থেকে সিদ্দীক ও নৈকট্যশীলগণ ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। রিয়া যখন এমন একটি অভ্যন্তরীণ ব্যাধি এবং শয়তানের বড় ফাঁদ, তখন এর স্বরূপ, স্তর, প্রকারভেদ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি অবগত হওয়া একান্ত জরুরী। তাই নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে।

রিয়ার উৎপত্তিস্থল ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ঃ জানা উচিত যে, প্রকৃত পক্ষে খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়াকে বলা হয় 'জাহ' তথা জাঁকজমক। এরূপ খ্যাতি শুভ নয়; বরং অখ্যাত এবং নাম-নিশানাশূন্য থাকা এরচেয়ে অনেক ভাল। তবে আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁর দ্বীনকে প্রচার করার সুখ্যাতি দান করেন এবং এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টা-চরিত্রের কোন দখল না থাকে, তবে এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত খ্যাতিতে কোন দোষ নেই। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

مِنَ الشَّرِّ اِلَّامَنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ اَنْ يُشِيْرَ النَّاسُ
اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ فِىْ دِيْنِهٖ وَدُنْيَاهُ-

অর্থাৎ, 'অনিষ্টের জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, মানুষ কারও দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে তার দিকে অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে। কিন্তু আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন, তার কথা স্বতন্ত্র।'

হযরত হাসান (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করলে লোকেরা তাঁকে বলল ঃ হে আবু সায়ীদ! আপনাকে দেখে মানুষ আপনার প্রতিও অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে। তিনি বললেন ঃ এ হাদীসে এ ইশারা বুঝানো হয়নি; বরং উদ্দেশ্য হলো ধর্মে কোন কোন নতুনত্ব সৃষ্টি করার কারণে যদি কারও দিকে ইশারা করা হয় অথবা নতুন পাপাচার আবিষ্কার করার কারণে ইশারার পাত্র হয়ে গেলে তা অনিষ্টকর। মোটকথা, তিনি হাদীসটির এমন ব্যাখ্যা দিলেন, যাতে কোন দোষ নেই।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ ব্যয় কর, খ্যাত করো না এবং নিজের অস্তিত্বকে বাড়িয়ে উপস্থিত করো না— যাতে মানুষ তোমাকে চিনে ফেলে এবং স্মরণ করে; বরং নিজেকে গোপন কর এবং চুপ থাক। এতে মুক্তি নিহিত রয়েছে। ধার্মিক লোকেরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং পাপাচারীরা জ্বলে-পুড়ে মরবে।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন ঃ যে খ্যাতিকে ভাল মনে করে, সে আল্লাহকে চিনে না। হযরত আইউব সখতিয়ানী বলেন ঃ যে পর্যন্ত কেউ তার বাসগৃহ মানুষের কাছে অজ্ঞাত থাকাকে পছন্দ না করবে, সে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার সত্যায়ন হয় না। খালেদ ইবনে মে'দানের ওয়াযের মজলিসে যখন অনেক লোক হয়ে যেত, তখন তিনি খ্যাতির ভয়ে মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন। আবুল আলিয়ার কাছে তিনজনের বেশী লোক সমাগম হলেই তিনি প্রস্থান করতেন। হযরত তালহা (রাঃ) একবার দেখলেন, তাঁর সাথে প্রায় দশজন লোক হেঁটে চলেছে। তিনি বললেন ঃ এরা লালসার মাছি এবং দোযখের ফড়িং। হযরত সোলায়মান ইবনে হানযালা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত উবাই ইবনে কা'বের পেছনে পেছনে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ হযরত উমর (রাঃ)-এর দৃষ্টি তাঁর উপর পতিত হল। তিনি দোররা নিয়ে তেড়ে আসলেন। হযরত কা'ব আরয করলেন ঃ আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি করছেন? একটু ভেবে দেখুন! তিনি বললেন ঃ যেরূপ সাড়ম্বরে তুমি গমন করছ, সেটা তাবেয়ীদের জন্যে ভ্রষ্টতার পথ এবং তোমার জন্যে পরীক্ষা।

হযরত হাসান (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) একদিন গৃহ থেকে বের হলে অনেক লোক তাঁর পেছনে চলতে লাগল। তিনি তাদের দিকে মুখ করে বললেন ঃ তোমরা আমার পেছনে আসছ কেন? আল্লাহর কসম, যে কারণে আমি আমার গৃহের দরজা বন্ধ রাখি, তা যদি তোমাদের জানা হয়ে যায়, তবে দুটি লোকও আমার সাথে চলবে না।

হযরত হাসান একদিন বাড়ী থেকে বের হলে লোকজন তাঁর পিছনে চলতে লাগল। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে কোন প্রয়োজন থাকলে ভাল, নতুবা আশ্চর্য নয় যে, এ পিছনে চলা ঈমানদারদের অন্তরে কিছু অবশিষ্ট রাখবে না। অর্থাৎ এতে আল্লাহর মারেফত বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি ইবনে মাজরিযের সাথে সফরে গেল। অতঃপর তার কাছ থেকে আলাদা হওয়ার সময় আরয করল ঃ আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ সম্ভবপর হলে এটা কর ঃ তুমি অপরকে চিনবে, কেউ যেন তোমাকে না চিনে। পথ চলার সময় কেউ যেন তোমার সাথে না থাকে। তুমি অপরকে জিজ্ঞেস করবে, কেউ যেন তোমাকে জিজ্ঞেস না করে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি আবু কেলাবের সঙ্গে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি অনেক পোশাক পরিহিত হয়ে সেখানে এল। তিনি বললেন ঃ এই বাকশক্তিশীল গাধা থেকে বেঁচে থাক। অর্থাৎ খ্যাতি অন্বেষণ করো না।

হযরত ছওরী (রহঃ) বলেন ঃ পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ দুটি খ্যাতি থেকে বেঁচে থাকতেন— একটি উৎকৃষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদের খ্যাতি এবং অপরটি ছিন্ন ও পুরাতন পোশাকের খ্যাতি। কেননা, উভয় পোশাকের প্রতি মানুষের দৃষ্টি সমভাবে নিবদ্ধ হয়। বিশর (রহঃ) বলেন ঃ খ্যাতি পছন্দ করেছে এবং ধর্ম বরবাদ হয়নি এরূপ ব্যক্তি আমার জানা নেই। তিনি আরও বলেন ঃ যে খ্যাতি কামনা করে, সে আখেরাতের স্বাদ পায় না।

খ্যাতিহীনতার ফযীলত ঃ বারা ইবনে' মালেক ও ইবনে মসউদ (রাঃ) -এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ অনেক বিক্ষিপ্তকেশী ধূলিধূসরিত চাদরওয়ালা লোক রয়েছে, যাদের দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না। অথচ যদি তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে কোন কথা বলে ফেলে, তবে আল্লাহ তা বাস্তবায়িত করে দেন। যদি বলে, ইলাহী! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি, তবে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতই দিবেন এবং দুনিয়াতে কিছু দেবেন না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, জান্নাতী তারাই— যাদের কেশ এলোমেলো এবং পোশাক দুটি মাত্র চাদর। যদি তারা শাসকদের কাছে যেতে চায়, তবে কেউ যেতে দেয় না। বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে কেউ তাদের প্রস্তাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। তাদের অভাব-অনটন তাদের বুকের মধ্যেই ঘুরাফেরা করে। কিয়ামতে তাদের নূর বন্টন করা হলে সমস্ত মানুষের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে।

বর্ণিত আছে, একবার হযরত উমর (রাঃ) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখলেন, মুয়ায ইবনে জাবল (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাযারের কাছে বসে কাঁদছেন। তিনি কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে মুয়ায বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, সামান্য রিয়াও শিরক। আল্লাহ তা'আলা এমন আত্মগোপনকারী মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন— যারা উধাও হয়ে গেলে কেউ তাদের খোঁজ করে না, আর সম্মুখে এলে কেউ তাদেরকে চিনে না। তারা হেদায়াতের প্রদীপ।

মোহাম্মদ ইবনে সুয়ায়দ (রহঃ) বর্ণনা করেন, একবার মদীনা মুনাওয়ারায় খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। জনৈক সাধু ব্যক্তি মসজিদে নববীতেই থাকত এবং দোয়া করত। একদিন সকলেই দোয়ায় রত ছিল, এমন সময় জনৈক পুরাতন ও ছিন্নবস্ত্র পরিহিত ব্যক্তি আগমন করল। সে এসে সংক্ষেপে দু'রাকআত নামায পড়ল এবং হাত তুলে দোয়া করল ঃ ইলাহী! আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি- এই মুহূর্তেই বৃষ্টিবর্ষণ কর। লোকটির দোয়া শেষ করে হাত নামানোর আগেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং দেখতে দেখতে এত বৃষ্টি বর্ষিত হল যে, মদীনার লোকজন ডুবে যাওয়ার আশংকায় ফরিয়াদ করতে লাগল। এরপর লোকটি আরয করল ঃ ইলাহী! যদি তুমি মনে কর যে, এই পরিমাণ পানি তাদের জন্যে যথেষ্ট, তবে বৃষ্টি থামিয়ে দাও। তখনি বৃষ্টি থেমে গেল। এরপর লোকটি সেই সাধু ব্যক্তির পেছনে পেছনে চলল এবং তার গৃহের সন্ধান করে ভোরেই তার

খেদমতে গিয়ে বলল ঃ আমি একটি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। তা এই যে, আপনি আমার জন্যে বিশেষভাবে দোয়া করুন। সাধু ব্যক্তি বলল ঃ সোবহানাল্লাহ! তুমি আমাকে দোয়া করতে বলছ! তোমার অবস্থা তো কালই জানতে পেরেছি। এখন বল এই মর্তবা তুমি কিরূপে লাভ করলে? সে বলল ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলেছি। তাই আমি তাঁর কাছে যে প্রার্থনা করেছি, তিনি তা কবুল করেছেন। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ হে লোক সকল! জ্ঞানের ঝরণা এবং হেদায়াতের প্রদীপ হও। নিজ নিজ ঘরে বসে থাক। পুরাতন বস্ত্র পরিধান কর, যাতে আকাশের বাসিন্দারা তোমাদেরকে চিনে এবং পৃথিবীর লোক না চিনে। এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْمَحَاذِ وَحَظٍّ مِنْ صَلٰوةٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَ فِي السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ ثُمَّ صَبَرَ عَلٰى ذٰلِكَ

অর্থাৎ, 'আমার ওলীদের মধ্যে সেই মুমিন ব্যক্তি অধিকতর ঈর্ষার যোগ্য, যে নিজের উপর পরিবার-পরিজনের বোঝা কম রাখে, নামাযে অংশগ্রহণ করে, পরওয়ারদেগারের এবাদত করে এবং গোপনে আনুগত্য করে। সে মানুষের মধ্যে এত সুখ্যাত নয় যে, মানুষ তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করবে। এরপর সে এ অবস্থায় সবর করে।

হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ যদি এমনভাবে থাকতে পার যে, তোমাকে কেউ না চিনে, তবে তাই কর। তোমাকে কেউ না চিনলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। কেউ তোমার প্রশংসা না করলেও কোন দোষ নেই। যদি তুমি মানুষের কাছে মন্দ হও এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ভাল হও, তবে এতেও কোন অনিষ্ট নেই।

উপরোক্ত হাদীস ও মনীষীর উক্তি থেকে খ্যাতির নিন্দা এবং খ্যাতিহীনতার ফযীলত পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। খ্যাতির আসল লক্ষ্য হচ্ছে

জাঁকজমক তথা মানুষের অন্তরে আসন প্রতিষ্ঠা করা। এটা অনর্থের মূল। এখানে প্রশ্ন হয় যে, পয়গম্বরগণ, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং ইমামগণ সর্বাধিক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। তাঁদের খ্যাতির চেয়ে অধিক খ্যাতি আর কি হবে? অতএব, তাঁরা খ্যাতিহীনতার ফযীলত থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলেন। এর জওয়াব এই যে, যে খ্যাতি অর্জন করে নেয়া হয়, তাই মন্দ। কিন্তু কোনরূপ চেষ্টা-তদবীর ছাড়া যে খ্যাতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পাওয়া যায়, তা নিন্দনীয় নয়।

যশপ্রীতির নিন্দা ঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا

অর্থাৎ, 'আখেরাতের সে গৃহ আমি তাদেরকে দান করব— যারা পৃথিবীতে উচ্চ হওয়ার এবং গোলযোগ সৃষ্টি করার ইচ্ছা করে না।'

এই আয়াতে দুটি ইচ্ছাকে একত্রিত করা হয়েছে— একটি উচ্চ হওয়ার ইচ্ছা এবং অপরটি গোলমাল সৃষ্টি করার ইচ্ছা। এরপর বলা হয়েছে, আখেরাত তার জন্যেই, যে উভয় প্রকার ইচ্ছা থেকে মুক্ত। অন্য আয়াতে আছে—

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার সাজসজ্জা কামনা করে, আমি তার আমল দুনিয়াতে পুরাপুরি দিয়ে দেই এবং তাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তাদের জন্যে আখেরাতে আগুন ছাড়া কিছুই নেই।' (সূরা হূদ ঃ ১৫-১৬

এই আয়াতও তার ব্যাপকতার মধ্যে জাঁকজমকপ্রীতিকে অন্তর্ভুক্ত

করেছে। কেননা, এটা পার্থিব জীবনের সকল আনন্দের চেয়ে বড় এবং সকল সাজসজ্জার চেয়ে অধিক। হাদীসে বলা হয়েছে—

حُبُّ الْمَالِ وَالْجَاهِ يُنْبِتَانِ النِّفَاقَ فِى الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ

অর্থাৎ, 'ধনসম্পদ ও জাঁকজমকের মোহ অন্তরে এমনভাবে মোনাফেকী উৎপন্ন করে, যেমন বৃষ্টির পানি শাক-সবজিকে উৎপন্ন করে।'

আরও বলা হয়েছে, দুটি বাঘ ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে এতটুকু ক্ষতি করে না, যতটুকু ক্ষতি করে গৌরব ও ধন-সম্পদের মোহ মুসলমান ব্যক্তির ধর্মপরায়ণতার। হযরত আলী (রাঃ)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, খেয়াল খুশী ও প্রশংসাপ্রীতির কারণেই মানুষ ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া এই, তিনি আপন কৃপা ও অনুগ্রহে আমাদেরকে এই বিপদ থেকে মুক্ত রাখুন।

জানা উচিত যে, 'মাল' ও 'জাহ' হচ্ছে দুনিয়ার দুটি স্তম্ভ। 'মাল' মানে উপকারী বস্তুসমূহের মালিক হওয়া এবং 'জাহ' বলা হয় সেইসব অন্তরের মালিক হওয়াকে, যাদের কাছ থেকে সম্মান ও আনুগত্য কামনা করা হয়। মালদার ও ধনী সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে টাকা-পয়সার ক্ষমতা রাখে এবং এর মাধ্যমে নিজের সমস্ত উদ্দেশ্য, খাহেশ ও মানসিক কামনা-বাসনা পূর্ণ করতে পারে। এমনিভাবে 'যশশীল' তথা প্রভাবশালী সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে মানুষের অন্তরকে এমনভাবে বশীভূত করে নেয় যে, তাদের দ্বারা যে কোন মতলব যথেচ্ছ সিদ্ধ করতে পারে। অর্থসম্পদ যেমন বিভিন্ন প্রকার পেশা ও কারিগরি দ্বারা অর্জন করা হয়, তেমনি মানুষের অন্তরও বিভিন্ন প্রকার কাজ-কারবারের মাধ্যমে আকৃষ্ট হয়। অন্তর যখন বিশ্বাস করে যে, অমুক ব্যক্তির মধ্যে অমুক বিষয়ের পূর্ণতাগুণ রয়েছে, তখন অন্তর তার বশীভূত হয়ে যায়। এখানে সেই গুণটি বাস্তবেও পূর্ণতাগুণ হওয়া শর্ত নয়, বরং ব্যক্তির মতে ও তার বিশ্বাসে পূর্ণতাগুণ হওয়াই যথেষ্ট। মাঝে মাঝে অন্তর এমন বিষয়কেও পূর্ণতাগুণ বলে বিশ্বাস করে— যা বাস্তবে পূর্ণতাগুণ

নয়; কিন্তু অন্তর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সেটাকে পূর্ণতাগুণ বলে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে নেয়। এ কারণেই অন্তর তার অনুগত হয়ে যায়। কেননা, আনুগত্য হচ্ছে অন্তরের একটি অবস্থা— যা বিশ্বাসের অনুগামী হয়ে থাকে। সুতরাং যেমন বিশ্বাস হবে, তেমনি অবস্থা দেখা দেবে।

যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের মহব্বত পোষণ করে, সে যেমন চায় যে, তার কাছে বাঁদী-গোলাম থাকুক, তেমনি যশপ্রিয় ব্যক্তিও চায়, সকল মানুষ তার গোলামী করুক এবং তাদের অন্তরের উপর তার সর্বময় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হোক; বরং যশপ্রিয় ব্যক্তি যা চায়, তা আরও বেশী। কেননা, সম্পদশালী ব্যক্তি বলপূর্বক বাঁদী-গোলামের মালিক হয়। বাঁদী-গোলামরা মন থেকে কোন সময় কারও ক্রীতদাস হতে চায় না। কিন্তু যশপ্রিয় ব্যক্তির আনুগত্য মানুষ সানন্দে গ্রহণ করে। স্বাধীন ব্যক্তি নিজের মনের আগ্রহে তার গোলাম হয় এবং তার গোলামী ও আনুগত্যকে গর্বের বিষয় মনে করে। এ থেকে জানা গেল যে, 'জাহ' শব্দের অর্থ মানুষের অন্তরে আসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া; অর্থাৎ অন্তরে কোন ব্যক্তির কোন পূর্ণতা গুণের বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যাওয়া। সুতরাং পূর্ণতার বিশ্বাস যে পরিমাণে হবে, সে পরিমাণেই আনুগত্য হবে এবং যে পরিমাণে আনুগত্য হবে, সে পরিমাণে মানুষের মনের উপর আধিপত্য বিস্তৃত হবে। ক্ষমতা যত বেশী হবে, আনন্দ ও যশপ্রীতি তত অধিক হবে। এ পর্যন্ত 'জাহ' শব্দের অর্থ বর্ণিত হল। এখন এর ফলাফল দেখা উচিত।

যশ তথা প্রভাব-প্রতিপত্তির এক ফল হচ্ছে প্রশংসা কীর্তন করা। যে ব্যক্তি কারও পূর্ণতাগুণে বিশ্বাস করে, সে তার প্রশংসা করার ব্যাপারে চুপ থাকে না। প্রতিপত্তির আরেকটি ফল হচ্ছে খেদমত করা ও সাহায্য-সহায়তা করা। বিশ্বাসী ব্যক্তি আপন বিশ্বাস অনুযায়ী নিজেকে বিশ্বস্ত ব্যক্তির খেদমত ও সাহায্যে নিয়োজিত রাখে এবং গোলামের ন্যায় তার অনুগত হয়ে থাকে। এছাড়া যশ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্যতম ফলাফল হচ্ছে বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে অগ্রণী মনে করা, তার সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করা, সম্মান প্রদর্শন করা এবং মজলিসে উত্তম জায়গায় বসানো।

যশের মহব্বতে ভাল ও মন্দ বিষয়াদি ঃ উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, যশের অর্থ হচ্ছে অন্তরসমূহের মালিক হওয়া ও তাদের উপর

ক্ষমতা বিস্তার করা। সুতরাং এর বিধানও ধন-সম্পদের মালিকানার বিধানের অনুরূপ। কেননা, যশও পার্থিব উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য, যা মৃত্যুর কারণে নিঃশেষ হয়ে যায়। যেহেতু দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র, তাই দুনিয়াতে উৎপন্ন বস্তু থেকেই আখেরাতের পাথেয় অর্জন করা সম্ভব। সুতরাং পানাহার ও পোশাকের জন্যে যেমন সামান্য অর্থসম্পদ জরুরী, তেমনি মানুষের সাথে জীবন যাপনের জন্যেও অল্পবিস্তর যশ-খ্যাতির প্রয়োজন। খোরাক একটি অপরিহার্য বস্তু। প্রয়োজন পরিমাণে খোরাক সংগ্রহ করা অথবা খোরাক ক্রয় করার অর্থ সংগ্রহ করা এবং এগুলোকে প্রিয় মনে করা যেমন জায়েয, তেমনি খেদমতের জন্যে একজন খাদেম, সাহায্য-সহায়তার জন্যে একজন সফরসঙ্গী, পথ প্রদর্শনের জন্যে একজন ওস্তাদ এবং দুষ্ট লোকের অনিষ্ট ও যুলুম থেকে রক্ষা পাবার জন্যে একজন শাসক থাকাও জায়েয। সুতরাং মালিকের এ বিষয়কে প্রিয় মনে করা যে, খাদেমের মনে তার এমন মাহাত্ম্য ও সম্মান থাকুক, যার কারণে সে খেদমত করতে উদ্বুদ্ধ হয় অথবা সফরসঙ্গীর অন্তরে এমন মর্যাদা থাকুক, যার কারণে সে সাহায্য থেকে বিরত না থাকে অথবা ওস্তাদের মনে এমন আসন থাকুক, যার কারণে সে উত্তমরূপে পদপ্রদর্শন করে অথবা শাসকের মনে এমন সম্মান থাকুক, যার কারণে সে অনিষ্ট দূরীকরণে সম্মত হয়– এসব বিষয়কে প্রিয় মনে করা নাজায়েয ও নিন্দনীয় নয়। কেননা, যশ ধনসম্পদের ন্যায় উদ্দেশ্য সাধনের একটি উপায়। উভয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

তবে এ সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত এই যে, স্বয়ং ধনসম্পদ ও যশ-খ্যাতিকে প্রিয় মনে করবে না; বরং এ সবের মহব্বতকে এরূপ মনে করবে, যেমন কারও ঘরে শৌচাগার রয়েছে এবং সে মলত্যাগের জন্যে এই শৌচাগার থাকাকে প্রিয় মনে করে। সে মনে করে, যদি তার মলত্যাগের প্রয়োজন না থাকে, তবে শৌচাগারের সাথেও তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। এ ব্যক্তিকে বাস্তবে পায়খানাকে মহব্বতকারী মনে করা হবে না। বরং এটা আসল লক্ষ্য অর্জনের উপায়কে মহব্বত করার নামান্তর।

এখন বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা দরকার। জনৈক ব্যক্তি তার বিবাহিত স্ত্রীকে একারণে মহব্বত করে যে, প্রয়োজনের সময় সে তার সাথে সহবাস করে। যেমন মলত্যাগের জন্যে পায়খানাকে ভাল মনে করা হয়। যদি এই ব্যক্তির মধ্যে কামপ্রবৃত্তির তাড়না না থাকে, তবে সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে; যেমন মলত্যাগের প্রয়োজন না থাকলে কেউ পায়খানায় যায় না। মাঝে মাঝে কেউ কেউ স্বয়ং স্ত্রীকেই ভালবাসে এবং তার রূপ লাবণ্যের জন্যে পাগলপারা থাকে। এমনকি, যদি কখনও সহবাস নাও হয়, তবু তাকে তালাক দিতে চায় না। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার মহব্বত। প্রথম প্রকার মহব্বত মহব্বতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যশখ্যাতি ও অর্থসম্পদের অবস্থাও তেমনি। এগুলো দ্বারা দৈহিক উদ্দেশ্য অর্জিত হয় বলে এগুলোকে মহব্বত করলে কোন অনিষ্ট নেই। আর যদি স্বয়ং এগুলোকেই মহব্বত করা হয়—উদ্দেশ্য লাভের উপায় হোক বা না হোক, অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণকে মহব্বত করা হয়, তবে তা নিন্দনীয়। তবে এরূপ মহব্বতকারী ব্যক্তি ফাসেক ও গোনাহগার হবে না– যে পর্যন্ত এই মহব্বতের কারণে কোন গোনাহ না করে বসে অথবা ধনসম্পদ ও জাঁকজমক অর্জন করার জন্যে প্রতারণা, চক্রান্ত, মিথ্যা ইত্যাদি উপায় অবলম্বন না করে। এগুলো অর্জন করার জন্যে কোন এবাদতকেও ওসীলা করা যাবে না। কেননা, এবাদতের মাধ্যমে ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সৃষ্টি করা ধর্ম মতে গোনাহ ও হারাম।

এখন বুঝা দরকার, খাদেম, সফরসঙ্গী, ওস্তাদ ও শাসকের মনে আসন প্রতিষ্ঠিত করার কোন নির্দিষ্ট সীমা আছে কি না কিংবা যতদূর ইচ্ছা তাদেরকে ভক্তি করতে পারবে? এর ব্যাখ্যা এই যে, তিন উপায়ে অপরকে ভক্তি করা যায়। তন্মধ্যে দুটি উপায় বৈধ ও একটি অবৈধ। অবৈধ উপায় এই যে, অপরকে এমন গুণের ভক্ত করা, যা নিজের মধ্যে নেই। যেমন তাকে বলা—আমি সাধক, পরহেযগার অথবা সৈয়দ বংশীয়; অথচ সে কিছুই না। এটা মিথ্যা ও প্রতারণা হওয়ার কারণে হারাম। বৈধ উপায় দুটির মধ্যে একটি হল নিজে যে গুণে গুণান্বিত, সে গুণের উপযোগী মর্যাদা চাওয়া। যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ) মিসরের শাসনকর্তাকে বলেছিলেন ঃ

اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

এতে তিনি শাসনকর্তার অন্তরে নিজের হেফাযতকারী ও বিজ্ঞ হওয়ার

গুণ কামনা করেছিলেন। শাসনকর্তার এরূপ ব্যক্তির প্রয়োজনও ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই উক্তি সঠিক ও সত্য ছিল। দ্বিতীয় উপায় হল, অপরের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের কোন দোষ অথবা গোনাহ গোপন রাখা। এটাও বৈধ। কেননা, পাপকর্ম গোপন রাখা জায়েয এবং প্রকাশ্যে বলা নাজায়েয। এছাড়া এতে কোন ধোকা নেই; বরং যে বিষয় জানার মধ্যে কোন ফায়দা নেই, তা না জানানো মাত্র।

অপরের সামনে উত্তমরূপে নামায আদায় করা, যাতে সে ভক্ত হয়ে যায়– এটাও নিষিদ্ধ। কেননা, এটা সরাসরি রিয়া ও প্রতারণা। অতএব, এভাবে জাঁকজমক জাহির করা হারাম।

মন আপন প্রশংসায় আনন্দিত ও নিন্দায় নিস্পৃহ হয় কেন ঃ জানা উচিত যে, চার কারণে অন্তর প্রফুল্ল ও আনন্দিত হয়। প্রথম কারণটি সর্বাধিক শক্তিশালী। তা এই যে, প্রশংসার কারণে মন জানতে পারে যে, সে পূর্ণতা গুণসম্পন্ন। কেননা, যে বিষয় দ্বারা প্রশংসা করা হয়, তা প্রকাশ্য অথবা সন্দিগ্ধ গুণ হতে পারে। যদি গুণটি প্রকাশ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, তবে আনন্দ কম হয়; যেমন কারও প্রশংসায় বলা হয়, সে দীর্ঘাকৃতি ও শ্বেতকায়। এটা যদিও এক প্রকার পূর্ণতা-গুণ, কিন্তু মন এ থেকে গাফেল থাকে। ফলে সে মোটেই আনন্দ পায় না। তবে অপর ব্যক্তির বলার কারণে যখন তার চৈতন্যোদয় হয়, তখন কিছু না কিছু আনন্দ পায়। আর যদি প্রশংসার বিষয়টি সন্দিগ্ধ হয়, তবে আনন্দ অনেক বেশী হয়। যেমন কারও শিক্ষাদীক্ষা, পরহেযগারী অথবা রূপলাবণ্যের প্রশংসা করা। মানুষ প্রায়ই এসব গুণের ব্যাপারে সন্দিহান থাকে এবং কোন না কোনরূপে এই সন্দেহ দূর হয়ে যাওয়ার বাসনা করতে থাকে। এরপর যখন অপরের মুখ থেকে এই ঈপ্সিত বক্তব্য শ্রবণ করে, তখন অসাধারণ আনন্দ অর্জিত হয়। এ কারণে অধিকতর আনন্দ তখন অর্জিত হয়, যখন এসব গুণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তির মুখ থেকে এই প্রশংসা উচ্চারিত হয়। উদাহরণতঃ কোন ওস্তাদ তার শাগরিদ সম্পর্কে বলে— তুমি বড় মেধাবী, বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত। এতে শাগরিদের মনে আনন্দ আর ধরে না। কিংবা খারাপ লাগারও কারণ এটাই। এতে মন তার ত্রুটি সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করে। ত্রুটি

পূর্ণতার বিপরীত। সুতরাং পূর্ণতা যেমন প্রিয়, ত্রুটি তেমনি অপ্রিয় হয়ে থাকে। অপরের মুখ থেকে যখন নিজের ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হবে, তখন অবশ্যই তা খারাপ লাগার বিষয়, বিশেষত যখন বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নিন্দা করবে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, প্রশংসা দ্বারা জানা যায় প্রশংসাকারীর অন্তর প্রশংসিত ব্যক্তির মালিকানাধীন, বশীভূত ও ভক্ত। অন্তরের মালিকানা লাভ করা সকলেরই প্রিয় ও পছন্দনীয়। যখন জানবে যে, প্রশংসাকারী ব্যক্তি তার ভক্ত এবং তার অন্তর তার ইচ্ছার অনুগামী, তখন নিশ্চিতরূপেই সে আনন্দিত হবে। বিশেষত যদি প্রশংসাকারী ব্যক্তি অধিক ক্ষমতাবান হয় এবং তাকে দিয়ে অধিক কার্যোদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে, তবে আনন্দ আরও বেশী হবে।

আনন্দের তৃতীয় কারণ এরূপ ব্যক্তির প্রশংসা করা, যার কথা সকলেই শুনে এবং মূল্য দেয়। কিন্তু এর জন্যে শর্ত হল যে, প্রশংসা অথবা নিন্দা জনসমক্ষে হওয়া। সুতরাং সমাবেশ যত বেশী হবে এবং প্রশংসাকারী যত বেশী মান্যবর হবে, আনন্দ তত বেশী হবে। এর বিপরীতে নিন্দা অধিক খারাব লাগবে।

চতুর্থ কারণ, প্রশংসা দ্বারা প্রশংসিত ব্যক্তির প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী হওয়া বুঝা যায়। ফলে, প্রশংসাকারী তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যায়—মনের আগ্রহে হোক অথবা চাপের কারণে হোক। চাপও মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে। কারণ, এতে এক প্রকার প্রাবল্য পাওয়া যায়। এ কারণেই প্রশংসাকারীর অন্তর প্রশংসার বিষয়বস্তুতে বিশ্বাসী না হলেও প্রশংসিত ব্যক্তি আনন্দিত হয়।

যদি উপরোক্ত চারটি কারণই এক প্রশংসাকারীর মধ্যে একত্রিত হয়ে যায়, তবে চরম পর্যায়ের আনন্দ ও স্বাদ অর্জিত হয়।

প্রশংসা দ্বারা অন্তরের আনন্দ লাভ করার কারণ এবং নিন্দা দ্বারা দুঃখিত হওয়ার কারণ সম্পর্কিত এ আলোচনাটির অবতারণা এ জন্যে করা হল, যাতে প্রশংসার মহব্বত ও নিন্দার কারণে দুঃখ পাওয়ার চিকিৎসা জানা যায়। কেননা, যে রোগের কারণ জানা থাকে না, তার চিকিৎসাও সম্ভব হয় না। রোগের কারণ দূর করাই চিকিৎসা।

যশখ্যাতির চিকিৎসা ঃ প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তির অন্তরকে যশ-প্রীতি আচ্ছন্ন করে নেয়, সে সর্ব প্রযত্নে এ বিষয়েই ব্যাপৃত থাকে যে, মানুষের সহৃদয়তা যেন হাতছাড়া না হয় এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সে কথায় ও কাজে-কর্মে সর্বদা খেয়াল রাখে, যাতে মানুষের মধ্যে তার মর্যাদা বেড়ে যায়। বাস্তবে এ বিষয়টি নিফাকের বীজ এবং অনর্থের মূল। এর ফলে ক্রমে ক্রমে এবাদতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শিত হতে থাকে, রিয়ার প্রভাব বেড়ে যায় এবং মানুষের মন আকৃষ্ট করার জন্যে নিষিদ্ধ বিষয়াদিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। একারণেই রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

حُبُّ الشَّرَفِ وَالْمَالِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ

অর্থাৎ, 'গৌরব ও ধন-সম্পদের মোহ নিফাক উৎপন্ন করে, যেমন পানি শাক-সবজি উৎপন্ন করে।'

কেননা, নিফাক বলা হয় মানুষের বাহ্যিক অবস্থা তথা কথা ও কাজ তার অন্তরের বিপরীত হওয়াকে। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্তরে মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছুক, সে নিফাক সহকারে তাদের সম্মুখীন হবে এবং মনের উপর জোর দিয়ে উত্তম স্বভাব তাদের সামনে পেশ করবে। অথচ সে এসব স্বভাব থেকে মুক্ত। এ থেকে জানা গেল যে, যশপ্রীতি বিনাশকারী বিষয়সমূহের অন্যতম। তাই এর চিকিৎসা জরুরী। কেননা, এ রোগটি ধন-সম্পদের মহব্বতের ন্যায় একটি মজ্জাগত রোগ।

যশপ্রীতির চিকিৎসা দু'টি—একটি জ্ঞানগত ও অপরটি কর্মগত। জ্ঞানগত চিকিৎসা এই যে, যে কারণে যশলাভের মোহ সৃষ্টি হয়েছে, তা জানতে হবে। বলা বাহুল্য, এর কারণ হচ্ছে মানুষের দেহ ও মনের উপর ক্ষমতা অর্জন করা। মানুষ যদি এ বিষয়টি অর্জন করতে সক্ষমও হয়ে যায়, তবে চিন্তা করা দরকার; মৃত্যুই এর শেষ সীমা। মৃত্যুর পর এটা কোন উপকারে আসে না। এটি "বাকিয়াতে সালেহাত" তথা অক্ষয় সৎকর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, মৃত্যুর পরও এর কার্যকারিতা অবশিষ্ট থাকবে। ধরে নেয়া যাক, যদি পূর্ব-পশ্চিমের সকল মানুষ এক ব্যক্তিকে সেজদা করতে থাকে এবং পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সকলেই সেজদারত থাকে,

তবু না সেজদাকারীরা থাকবে, না স্বয়ং সেই ব্যক্তি থাকবে; বরং তারা সকলেই একদিন অন্যান্য মহাপুরুষের ন্যায় মাটির সাথে মিশে যাবে। সুতরাং এমন ক্ষয়িষ্ণু বিষয়ের জন্যে অনন্ত ও অক্ষয় জীবন লাভের মাধ্যম ধর্মকে বিসর্জন দেয়া মোটেই উচিত নয়। সত্যিকার পূর্ণতা কি— এ বিষয়টি যে বুঝে নিয়েছে, তার দৃষ্টিতে যশখ্যাতি নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়। কিন্তু এটা বুঝতে সে-ই সক্ষম, যে আখেরাতে উপস্থিতিকে চোখের সম্মুখে দেখে, দুনিয়াকে হেয় মনে করে এবং মৃত্যুকে মনে করে যেন এসে গেছে। হযরত হাসান বসরীর অবস্থা তেমনি ছিল। তিনি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)-কে এক পত্রে লিখেছিলেন ঃ আপনার বিশ্বাস করা উচিত যে, আপনি মরে গেছেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযও এ ব্যাপারে পেছনে ছিলেন না। তিনি জওয়াবে লিখলেন ঃ ধারণা করা উচিত যেন আপনি দুনিয়াতে কখনও আসেননি—চিরকাল আখেরাতেই রয়েছেন।

বলা বাহুল্য, এই বুযুর্গগণের দৃষ্টি আখেরাতেই নিবদ্ধ ছিল। ফলে, তারা দুনিয়াতে যশখ্যাতি ও ধন-সম্পদকে হেয় মনে করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। তারা কেবল দুনিয়াকেই দেখে এবং পরিণতির খেয়াল করে না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

অর্থাৎ, 'কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও; অথচ আখেরাত হল উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী।'

আরও বলা হয়েছে—

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ -

অর্থাৎ, 'কখনও নয়; বরং তোমরা দুনিয়াকে ভালবাস এবং আখেরাতকে পরিত্যাগ কর।'

সুতরাং যার অবস্থা এরূপ, তার উচিত যশপ্রীতির বিপদাপদকে জানা এবং দুনিয়াতে যশশালী ব্যক্তিরা যে সকল বিপদের সম্মুখীন হয়, সেগুলো চিন্তা করা।

দুনিয়াতে যশশালী ব্যক্তিমাত্রই হিংসার পাত্র হয়ে থাকে। মানুষ তার

ক্ষতিসাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। সে-ও সর্বক্ষণ আশংকা করতে থাকে যে, কোথাও মানুষের অন্তর থেকে তার মর্যাদা বিলীন হয়ে যায়। কেননা, মানুষের অন্তর সদা পরিবর্তনশীল। কখনও একদিকে এবং কখনও অন্যদিকে থাকে। এক সময় যাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করা হয়, অন্য সময় তাকেই জুতার মালা দিতে কসুর করা হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি মানুষের মনের উপর ভরসা করে, সে যেন সমুদ্রের তরঙ্গমালার উপর গৃহ নির্মাণ করে। অতএব আপন যশখ্যাতি সংরক্ষণের চিন্তা, হিংসাকারীদের চক্রান্ত প্রতিহত করা এবং শত্রুদের শত্রুতা নিবারণ করা– জাগতিক এসব আপদ-বিপদের কারণে যশখ্যাতির আনন্দ সর্বদাই মলিন থাকে। দুনিয়াতে মানুষ এ থেকে যতটুকু সুখ আশা করে, তার চেয়ে অনেক বেশী বিপদাশংকায় জড়িত থাকে। আসল উদ্দেশ্য যে আখেরাতের উপকার, তার তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

যশখ্যাতির কর্মগত চিকিৎসা হল এমন কাজ করা, যাতে মানুষ তিরস্কারের যোগ্য হয়ে পড়ে এবং অপরের দৃষ্টিতে ঘৃণার্হ হয়ে যায়। এতে করে জনপ্রিয় হওয়ার নেশা কেটে যাবে। এছাড়া মানুষের কাছে অখ্যাত ও মন্দ সাব্যস্ত হওয়ার দিকটিকে পছন্দ করে নিতে এবং কেবল আল্লাহর প্রিয় হওয়াতেই সন্তুষ্ট থাকবে। এটা 'মালামতী' সম্প্রদায়ের অনুসৃত পদ্ধতি। তারা যশখ্যাতির বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে এমন গোনাহ ও কুকর্ম করে থাকে, মানুষের দৃষ্টিতে পুরাপুরি অসম্মানের পাত্র হয়ে যায়। কিন্তু এ উপায় পথপ্রদর্শক ও ধর্মীয় নেতাদের জন্যে জায়েয নয়। কেননা, তাদের কীর্তিকলাপ দেখে মুসলমানদের মনে ধর্মের কাজে শৈথিল্য আসবে। এছাড়া যে ব্যক্তি অনুসৃত নেতা নয়, তার জন্যেও বিশেষ এ চিকিৎসার খাতিরে হারাম কাজ করা জায়েয নয়; বরং তার জন্যে বৈধ কাজসমূহের মধ্যে এমন কাজ করা জায়েয, যা দ্বারা মানুষের মধ্যে তার মূল্য হ্রাস পায়।

উদাহরণতঃ বর্ণিত আছে যে, জনৈক বাদশাহ এক দরবেশের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। যখন দরবেশ শুনল, বাদশাহ তার আস্তানার কাছাকাছি এসে গেছেন, তখন সে খাদ্য ও শাক আনিয়ে গোগ্রাসে খেতে শুরু করল। বাদশাহ তাকে এভাবে খেতে দেখে তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন এবং সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। দরবেশ বলল ঃ আল্লাহ পাকের হাজার শোকর, যিনি বাদশাহকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। কোন কোন বুযুর্গ এমন রঙীন পিয়ালায় শরবত পান করেছেন, যা দেখে লোকেরা তাকে শরাবখোর মনে করে চলে গেছে। যদিও এরূপ করা ফেকাহ শাস্ত্রের দৃষ্টিতে জায়েয নয়; কিন্তু বুযুর্গগণ অন্তরের সংশোধন এছাড়া অন্য কোন কাজের মধ্যে পাননি বলে বাধ্য হয়ে এরূপ করেন। পরে অবশ্য তারা এ বাড়াবাড়ির ক্ষতিপূরণ করে নেন। বর্ণিত আছে, জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি সংসার নির্লিপ্ততায় মশগুল হলে লোকজন তার কাছে ভিড় করতে শুরু করে। তিনি এ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে একদিন হাম্মামে গেলেন এবং অন্য এক ব্যক্তির বস্ত্র পরিধান করে বাইরে এলেন এবং প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরা চুরি যাওয়া বস্ত্র চিনতে পেরে তাকে ধরল এবং চোর চোর বলে খুব মারপিট করল। এরপর থেকে কোন লোক সেই বুযুর্গের আস্তানায় গেল না।

যশখ্যাতি নির্মূল করার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে নির্জনবাস এবং এমন জায়গায় চলে যাওয়া, যেখানে কেউ না চিনে। যদি গৃহে বসে থাকে এবং যে শহরে খ্যাত হয়েছে, সেখানেই থাকে, তবে এ নির্জনবাস দ্বারা মানুষের মনে আরও বেশী বিশ্বাস ও মর্যাদা বেড়ে যাবে।

প্রশংসার চিকিৎসা ঃ মানুষের মন্দ বলার ভয় এবং তাদের প্রশংসা পাওয়ার মোহ অধিকাংশ লোকের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। এরূপ লোকেরা মানুষের মরযী অনুযায়ী সকল কাজকর্ম করার চেষ্টা অবশ্যই করে, যাতে সকলেই প্রশংসা করে এবং নিন্দার ভয় না থাকে। এটা বিনাশকারী বিষয়সমূহের অন্যতম। তাই এর চিকিৎসা অত্যাবশ্যক। এর চিকিৎসা পদ্ধতি হলো, প্রশংসার মোহ এবং নিন্দার ঘৃণার যে সকল কারণ রয়েছে, সেগুলো দেখতে হবে। উদাহরণতঃ প্রথম কারণ হচ্ছে প্রশংসাকারীর কথায় নিজের পূর্ণতা সম্পর্কে অবগত হওয়া। এতে প্রশংসিত ব্যক্তির উচিত আপন বিবেক-বুদ্ধির শরণাপন্ন হওয়া এবং মনে মনে চিন্তা করা যে, যে গুণের দ্বারা আমার প্রশংসা করা হয়েছে, সেটা আমার মধ্যে আছে কি না? যদি থাকে, তবে সেটা আনন্দিত হওয়ার যোগ্য কি না? বলা বাহুল্য,

জ্ঞান-গরিমা, সংসার নির্লিপ্ততা ইত্যাদি গুণ হলে তা অবশ্যই আনন্দিত হওয়ার যোগ্য। আর ধন-দৌলত, যশখ্যাতি ইত্যাদি পার্থিব বিষয় হলে তা আনন্দিত হওয়ার যোগ্য নয়। যদি আলোচ্য গুণটি পার্থিব বিষয় হয়, তবে তার জন্যে উল্লসিত হওয়া খড়কুটার জন্যে উল্লসিত হওয়ার মতই, যা দু'দিন পরেই শুকিয়ে বাতাসের সাথে উড়ে যাবে। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই এ ধরনের আনন্দ হয়ে থাকে। অতএব, পার্থিব আসবাবপত্রের জন্যে আনন্দ করা অনুচিত। আর যদি আলোচ্য গুণটি জ্ঞান-গরিমা ও সংসার নির্লিপ্ততা হয়, তবু উল্লসিত হওয়া উচিত নয়। কেননা, অন্তিম অবস্থা কি হবে, তা কারও জানা নেই। জ্ঞান ও সংসার নির্লিপ্ততা অবশ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু পরিণাম অশুভ হওয়ার আশংকা লেগেই থাকে। যদি শুভ পরিণামের আশা সঞ্চারিত হয়, তবে জ্ঞান ও সংসার নির্লিপ্ততাকে আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহ মনে করে আনন্দিত হওয়া উচিত– প্রশংসাকারীর প্রশংসার জন্যে নয়। জানা দরকার যে, প্রশংসার দরুন ফযীলত বৃদ্ধি পায় না।

পক্ষান্তরে যদি গুণটি এমন হয়, যা প্রশংসিত ব্যক্তির মধ্যে নেই, তবে এরূপ গুণের জন্যে আনন্দিত হওয়া পাগলামি বৈ কিছু নয়। এর উদাহরণ এমন, যেমন কোন ব্যক্তি অপরকে হাসির ছলে বলে ঃ আপনার পেটের বিষ্ঠা কত সুবাসিত। যখন আপনি মলত্যাগ করেন, তখন সুবাসে চতুর্দিক আমোদিত হয়ে যায়। অথচ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানে, তার পেটে নেহায়েত দুর্গন্ধযুক্ত নাপাকী রয়েছে। এরপরও যদি সে প্রশংসার কারণে উল্লসিত হয়, তবে সেটা পাগলামি নয় কি? সারকথা, প্রশংসাকারী যদি সত্য প্রশংসা করে, তবে প্রশংসতি ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা ভেবে আনন্দ প্রকাশ করবে, আর মিছামিছি প্রশংসা করলে দুঃখ প্রকাশ করবে। প্রশংসার জন্যে কোন অবস্থাতেই উল্লাস করা উচিত নয়।

প্রশংসায় আনন্দিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, এতে বুঝা যায়, প্রশংসাকারীর অন্তর প্রশংসিত ব্যক্তির বশীভূত হয়ে গেছে এবং আরও হবে। এর পরিণতি এবং যশপ্রীতির পরিণতি একই, যার চিকিৎসা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আনন্দের তৃতীয় কারণ প্রশংসিত ব্যক্তির ভয়ভীতি। যার কারণে প্রশংসাকারী প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। এটা একটা সাময়িক ও অস্থায়ী ক্ষমতা। ফলে আনন্দ করার যোগ্য নয়। বরং এ কারণে প্রশংসা করা হলে সেজন্য দুঃখ করা, খারাপ মনে করা, রাগ করা উচিত। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রশংসায় আনন্দিত হয়, সে নিজের মধ্যে শয়তানকে প্রবেশ করার পথ করে দেয়। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম প্রশংসাকে খুব ভয় করতেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের একজন এক ব্যক্তিকে কিছু জিজ্ঞেস করলে সে আরয করল ঃ আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। তিনি রাগ করে বললেন ঃ আমাকে পাকসাফ বলার আদেশ আমি তোমাকে করিনি।

নিন্দাকে ঘৃণা করার চিকিৎসা ঃ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, নিন্দাকে ঘৃণা করার কারণ প্রশংসাপ্রীতির কারণের বিপরীত। সুতরাং চিকিৎসাও প্রশংসাপ্রীতির চিকিৎসা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সংক্ষেপে এর বর্ণনা এই যে, যে ব্যক্তি তোমার নিন্দা করে, সে যদি তার কথায় সত্যবাদী হয় এবং হিতাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে নিন্দা করে, তবে তার উপর রাগ করা, বিদ্বেষ পোষণ করা এবং মন্দ কথা বলা উচিত নয়। কেননা, এরূপ ব্যক্তি তোমার দোষ বর্ণনা করে তোমাকে ধ্বংসের পথ থেকে বাঁচাতে চায়। আর যদি সে তোমাকে কষ্ট দেয়ার নিয়তে নিন্দা করে, তবু তার কথায় তোমার উপকারই হবে। কেননা, সে তোমার সে দোষ বলে দিয়েছে, যা তুমি জানতে না। বলা বাহুল্য, এটা সৌভাগ্যের কারণ। অবশ্য কষ্ট দেয়ার নিয়ত করে নিন্দাকারী নিজেরই অনিষ্ট করে। কিন্তু তোমার জন্যে তার উক্তি নেয়ামতস্বরূপ। আর যদি নিন্দাকারী তার কথায় মিথ্যাবাদী হয়, তবে এমতাবস্থায়ও খারাপ লাগা উচিত নয়। বরং এ ক্ষেত্রে দেখা দরকার, যদিও সেই বিশেষ দোষটি তোমার মধ্যে নেই; কিন্তু এর মত দোষ আরও থাকতে পারে। অতএব, শোকর করা উচিত যে, নিন্দাকারী সেসব দোষ সম্পর্কে অবগত হয়নি এবং এমন দোষ বলেই ক্ষান্ত হয়ে গেছে, যা তোমার মধ্যে নেই। এ ছাড়া যে ব্যক্তি তোমার দোষ বলে, সে তার পুণ্যসমূহ তোমাকে উপহার দেয়, আর যে তোমার প্রশংসা করে, সে হাদীস অনুযায়ী তোমার কোমর ভেঙ্গে দেয়। অতএব, কোমর ভাঙ্গার কারণে তুমি

আনন্দিত হবে, আর পুণ্য আসার কারণে দুঃখিত হবে, এটা কেমন কথা! পুণ্য এলে তো আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়, যার জন্য তুমি আগ্রহী থাক। আরও একটি বিষয় চিন্তা করা উচিত যে, নিন্দাকারী ব্যক্তি তোমার নিন্দা করে নিজের ধর্ম বরবাদ করেছে এবং আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে পড়েছে। অতএব, তোমার রাগ করা ও তাকে বদদোয়া দেয়া উচিত নয়। বরং এরূপ দোয়া করা দরকার– ইলাহী! তাকে যোগ্যতা দাও, তার প্রতি রহম কর এবং তার তওবা কবুল কর। দেখ, উহুদ যুদ্ধে যখন কাফেররা রসূলে আকরাম (সাঃ) -এর দন্ত মোবারক শহীদ করেছিল, মস্তক ক্ষত-বিক্ষত করেছিল এবং তাঁর পিতৃব্য আমীর হামযা (রাঃ)-কে শহীদ করেছিল, তখন তিনি এই দোয়া করেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ, ইলাহী! আমার কওমকে সৎপথ প্রদর্শন কর। কারণ, তারা অজ্ঞ।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) এমন এক ব্যক্তির জন্যে নেক দোয়া করেছিলেন, যে তার মাথায় আঘাত করেছিল। লোকেরা বলল ঃ এ ক্ষেত্রে নেক দোয়া করার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ আমি নিশ্চিতরূপে জানি, তার এ আচরণের কারণে আমি সওয়াব পাব। কাজেই আমি এটা ভাল মনে করি না যে, যার দিক থেকে আমি সওয়াব পাব, সে আমার দিক থেকে আযাব ভোগ করুক।

রিয়ার নিন্দা ঃ কোরআন পাকের আয়াত, হাদীস এবং বুযুর্গগণের উক্তি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, রিয়া হারাম এবং রিয়াকার আল্লাহ তা'আলার গযবে পতিত। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ

অর্থাৎ, 'দুর্ভোগ সেই নামাযীদের জন্য, যারা তাদের নামায থেকে গাফেল, যারা লোক দেখানো নামায পড়ে অর্থাৎ রিয়া করে।'

আরও আছে–

اَلَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَكْرُ اُولٰئِكَ هُوَ يَبُوْرُ

অর্থাৎ, 'যারা কুকর্মের চক্রান্তে লিপ্ত, তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই।'

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) এর তাফসীরে বলেন ঃ আয়াতে বর্ণিত লোকেরা হচ্ছে রিয়াকার। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে—

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَا شُكُوْرًا -

অর্থাৎ, 'আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে তোমাদেরকে অন্ন দেই। আমরা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা আশা করি না।'

এতে আন্তরিকতাসম্পন্ন লোকদের প্রশংসা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যকিছু আশা করে না। রিয়া হচ্ছে এরই বিপরীত। আরও বলা হয়েছে—

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا -

অর্থাৎ, 'অতএব, যে তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাঁর এবাদতে কাউকে শরীক না করে।'

আয়াতটি এমন লোকদের শানে নাযিল হয়েছে, যারা তাদের এবাদত ও সৎকর্মের মজুরী ও প্রশংসা কামনা করত। রসূলে করীম (সাঃ)-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! মুক্তি কিসের মধ্যে? তিনি বললেন ঃ

ان لا يعمل العبد بطاعة الله يريد بها الناس -

অর্থাৎ, 'আল্লাহর আনুগত্যে এমন কাজ না করার মধ্যে, যার উদ্দেশ্য হয় মানুষ।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত শহীদ, দাতা ও কারী

সম্পর্কিত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককে বলবেন— তুমি মিথ্যাবাদী! তুমি আল্লাহর জন্যে যুদ্ধ করনি। বরং এ জন্যে করেছ, যাতে মানুষ তোমাকে বীর বলে। তুমি আল্লাহর জন্যে দান-খয়রাত করনি; বরং দাতা বলে প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্যে করেছ। তুমি আল্লাহর জন্যে কোরআন পাঠ করনি; বরং কারী বলে খ্যাত হওয়ার জন্যে করেছ। এ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তারা সওয়াব পায়নি এবং রিয়া তাদের সকল কর্ম বরবাদ করে দিয়েছে।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– আমি তোমাদের জন্যে যেসব বিষয়ের ভয় করি, তন্মধ্যে অধিক ভয়াবহ বিষয় হচ্ছে "শিরকে আসগর" তথা ক্ষুদ্র শিরক। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেনঃ ক্ষুদ্র শিরক কি? তিনি বললেন ঃ রিয়া। এরপর তিনি এরশাদ করলেন ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِذَا جَازَى الْعِبَادَ بِاَعْمَالِهِمْ اِذْهَبُوْا اِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاءُوْنَ فِى الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمُ الْجَزَاءَ –

অর্থাৎ, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দার ক্রিয়াকর্মের প্রতিদান দিবেন, তখন বলবেন ঃ তোমরা দুনিয়াতে যাদেরকে দেখানোর জন্যে আমল করতে, তাদের কাছে যাও, এরপর দেখ তাদের কাছে কোন প্রতিদান পাও কিনা?'

হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন ঃ তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে, তখন মাথায় ও দাড়িতে যেন তৈল লাগিয়ে নেয় এবং ঠোঁটের উপর যেন হাত বুলিয়ে নেয়, যাতে মানুষ তাকে রোযাদার মনে না করে। যখন কেউ ডান হাতে কিছু দান করে, তখন যেন বাম হাত তা জানতে না পারে। আর নামায পড়ার সময় দরজায় পর্দা ছেড়ে দেয়া উচিত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা প্রশংসাও তেমনি বণ্টন করেন, যেমন রুযী বণ্টন করেন।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তখন তার উপরকার বস্তুসমূহ কাঁপতে লাগল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা

পর্বতমালা সৃষ্টি করে সেগুলোকে পৃথিবীর জন্যে পেরেক স্বরূপ করে দিলেন। ফেরেশতারা পরস্পর বলাবলি করল ঃ আল্লাহ তা'আলা পর্বত অপেক্ষা অধিক শক্ত কোন বস্তু সৃষ্টি করেননি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা লোহা সৃষ্টি করলেন। সে পাহাড়-পর্বতকে কেটে দিল। এরপর আল্লাহ আগুন সৃষ্টি করলেন। সে লোহাকে গলিয়ে দিল। এরপর পানিকে আদেশ করা হল। সে আগুনকে নিভিয়ে দিল। অতঃপর বায়ুকে আদেশ করা হল। সে পানিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিল। এসব কাণ্ড দেখে ফেরেশতাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল যে, সকলের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী কোন্ বস্তুটি? তারা বলল ঃ এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করা দরকার। সেমতে তারা আরয করল ঃ ইলাহী আপনার সৃষ্টির মধ্যে কোন্ বস্তুটি সর্বাধিক শক্ত? এরশাদ হল ঃ আমার কাছে সবচেয়ে বেশী শক্ত আদম সন্তানের অন্তর। সে ডান হাতে খয়রাত করে; কিন্তু বাম হাতকে তা জানতে দেয় না। তার চেয়ে অধিক শক্ত কোন বস্তু আমি সৃষ্টি করিনি।

রিয়ার স্বরূপ ঃ প্রকাশ থাকে যে, রিয়া শব্দটি আরবী 'রুইয়ত' ধাতু থেকে উদ্ভূত। অর্থ, দেখা। এমনিভাবে খ্যাতির অর্থে ব্যবহৃত "সুমআ" শব্দটি "সেমা" ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ শ্রবণ করা। রিয়ার আসল অর্থ হচ্ছে মানুষকে ভাল স্বভাব-চরিত্র দেখিয়ে তাদের কাছে মর্যাদাবান হওয়া। যেহেতু এবাদত দ্বারাও যশ ও মর্যাদা অর্জিত হতে পারে, তাই সাধারণের পরিভাষায় রিয়া বিশেষভাবে সেই অবস্থাকে বলা হয়, যাতে এবাদতের দিক দিয়ে অন্তরে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্য হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এবাদত দ্বারা নিজের প্রতি মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করা। অতএব, এখানে চারটি বিষয় একত্রিত রয়েছে। (১) রিয়াকার। সে হচ্ছে এবাদতকারী। (২) যার জন্যে রিয়া করা হয়। সে হচ্ছে মানুষ। মানুষকে দেখানোই লক্ষ্য থাকে। (৩) যা দেখানো উদ্দেশ্য; অর্থাৎ, এবাদত ও অভ্যাস, যা রিয়াকার প্রকাশ করতে চায়। (৪) স্বয়ং রিয়া; অর্থাৎ, এবাদত প্রকাশ করার ইচ্ছা।

মানুষ পাঁচ প্রকার বস্তুর মধ্যে রিয়া করতে পারে—শরীর, আকার-আকৃতি, কথা, কর্ম ও সঙ্গী-সাথী। কিন্তু এবাদত নয়—এমন বস্তুতে রিয়া করা এবাদতে রিয়া করার তুলনায় হাল্কা।

রিয়ার প্রথম প্রকার হচ্ছে শরীর প্রদর্শন করা। ধর্মীয় ক্ষেত্রে এর পদ্ধতি শরীরে ক্ষীণতা-শীর্ণতা ও ফ্যাকাসে ভাব প্রকাশ করা, যাতে মানুষ মনে করে, এ ব্যক্তি ধর্মকর্মে খুব মেহনত করে এবং তার মধ্যে ধর্মের ভয় প্রবল। অথবা সে খাদ্য কম খায়। কিংবা ফ্যাকাসে ভাব দেখে মানুষ ধারণা করে যে, সে রাত্রি জাগরণ করে এবং এবাদত করে। এর কাছাকাছি ক্ষীণস্বরে কথা বলা, চক্ষু কোটরাগত হওয়া ও ঠোঁট শুষ্ক থাকা। এগুলো দ্বারা বুঝা যায়, লোকটি চির রোযাদার। এ কারণেই হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রোযা রাখে, তখন যেন মাথায় তৈল মালিশ করে, চিরুনি করে এবং চোখে সুরমা ব্যবহার করে, যাতে সে রিয়াপ্রবণ না হয়ে যায়। দ্বীনদার ব্যক্তিরা এভাবে শরীর প্রদর্শন করে। কিন্তু দুনিয়াদাররা এর বিপরীতে স্থূলদেহ, স্বচ্ছবর্ণ, সুঠাম দেহ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং দৈহিক শক্তি প্রদর্শন করে থাকে।

রিয়ার দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে আকার-আকৃতি ও পোশাক প্রদর্শন করা। উদাহরণতঃ মাথার কেশ এলোমেলো রাখা, গোঁফ মুণ্ডন করা, পথে মাথানত করে ধীরে ধীরে চলা, কপালে সেজদার চিহ্ন বাকী রাখা এবং অধৌত ও ছিন্নবস্ত্র পরিধান করা। এগুলো এজন্যে করা হয়, যাতে বোঝা যায় যে, লোকটি সুন্নতের অনুসারী এবং আল্লাহর নেকবান্দা। এর মধ্যে দাখিল রয়েছে তালিযুক্ত বস্ত্র পরিধান করা এবং সুফীগণের ন্যায় নীলরঙের পোশাক পরা, আলেম না হয়ে আলেমদের বিশেষ পোশাক পরিধান করা, যাতে মানুষ তাকে আলেম মনে করে, এটাও রিয়ার মধ্যে শামিল।

রিয়ার তৃতীয় প্রকার হচ্ছে, কথা। অর্থাৎ, লোক-দেখানোর জন্যে ওয়ায-নসীহত করা, জ্ঞানগর্ভ ও বিজ্ঞ কথাবার্তা বলা, দৈনন্দিন বাচন পদ্ধতিতে ব্যবহার করার জন্যে হাদীস ও মহাজন-উক্তি মুখস্থ করা, মানুষের সামনে যিকরের জন্যে ঠোঁট নাড়াচাড়া করা, জনসমক্ষে ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখা।

রিয়ার চতুর্থ প্রকার হচ্ছে, আমল। অর্থাৎ, লোক দেখানোর জন্যে নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করা, রুকু ও সেজদা লম্বা করা, স্থিরতা ও গাম্ভীর্য প্রকাশ করা। এমনিভাবে রোযা, জেহাদ, হজ্জ, সদকা ও খাদ্য খাওয়ানোর মধ্যে রিয়া হয়ে থাকে।

রিয়ার পঞ্চম প্রকার হচ্ছে সঙ্গী-সাথী ও সাক্ষাতকামী ব্যক্তিবর্গ। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি কামনা করে যে, অমুক আলেম অথবা আবেদ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসুক, যাতে মানুষ জানে যে, সে খুব দ্বীনদার। তাই এমন আলেম ও আবেদ তার কাছে আসা-যাওয়া করে। অথবা কেউ কোন শাসনকর্তার আগমন প্রত্যাশা করে , যাতে মানুষ মনে করে যে, সে ধর্মে অত্যন্ত মর্যাদাবান। তাই শাসনকর্তাও বরকত লাভের জন্যে তার কাছে আসে।

রিয়ার বিভিন্ন স্তর ঃ জানা উচিত যে, রিয়ার চারটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর হল, সওয়াবের ইচ্ছা মোটেই না থাকা। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি জনসমক্ষে নামায পড়ে এবং একাকী হলে পড়ে না; বরং মাঝে মাঝে উযু ছাড়াই মানুষের সাথে দাঁড়িয়ে যায়। এরূপ ব্যক্তির ইচ্ছা কেবল রিয়াই রিয়া। ফলে, সে আল্লাহর কাছে গযবের যোগ্য। রিয়ার এ স্তরটি কঠোরতর।

দ্বিতীয় স্তর হল, সায়াবের ইচ্ছা থাকবে, কিন্তু তা খুব দুর্বল। এমনকি, একান্তে থাকলে এ ইচ্ছা এতটুকু থাকে না যে, তার কারণে সেই আমলটি করে। এরূপ ব্যক্তিও প্রথমোক্ত ব্যক্তির কাছাকাছি। কেননা, তার এমন ইচ্ছা নেই, যার কারণে আমলটি করতে পারে। এরূপ ইচ্ছা থাকা-না থাকা সমান।

তৃতীয় স্তর হল, সওয়াবের ইচ্ছা এবং রিয়ার ইচ্ছা উভয়টি সমান থাকা। ফলে, উভয় ইচ্ছা একত্রিত হলে সে আমল করে এবং একটি অনুপস্থিত থাকলে আমল করে না। এরূপ ব্যক্তির অবস্থা এই যে, সে যতটুকু নষ্ট করে, ততটুকুই গড়ে। ফলে, আশা করা যায় যে, তার সওয়াবও হবে না এবং আযাবও হবে না অথবা যে পরিমাণ আযাব হবে, সেই পরিমাণ সওয়াব হবে। হাদীসসমূহের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায় যে, এরূপ ব্যক্তিও আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

চতুর্থ স্তর হল, রিয়ার ইচ্ছা দুর্বল এবং সওয়াবের ইচ্ছা প্রবল হওয়া। অর্থাৎ, মানুষ তার আমল জানতে পারলে তার স্ফূর্তি ও আনন্দ বেড়ে যায়; কিন্তু একাকী অবস্থায়ও এবাদত বর্জন করে না। আমাদের ধারণায় এরূপ

ব্যক্তির মূল সওয়াব বাতিল হবে না; বরং কিছুটা হ্রাস পাবে অথবা রিয়া পরিমাণে আযাব হবে এবং সওয়াবের ইচ্ছা পরিমাণে সওয়াব হবে।

আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্য দ্বারা রিয়া করা হলে সেদিকে লক্ষ্য করে রিয়ার দু'টি স্তর রয়েছে—মূল এবাদত দ্বারা রিয়া করা ও এবাদতের গুণ দ্বারা রিয়া করা। প্রথম স্তরের রিয়া অত্যন্ত মন্দ। এর তিনটি সোপান রয়েছে। প্রথম সোপান হচ্ছে মূল ঈমান দ্বারাই রিয়া করা। এরূপ রিয়াকার অনন্তকাল দোযখে বাস করবে। এ রিয়াকার সে ব্যক্তি, যে মুখে কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করে; কিন্তু অন্তরে তাকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করে। নিছক লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে মুসলমানী প্রকাশ করে। কোরআন পাকের একাধিক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা এ রিয়াকারদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এক জায়গায় এরশাদ হয়েছে ঃ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ -

অর্থাৎ, '(হে রসূল!) যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে, তখন বলে ঃ আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি তাঁর রসূল। আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'

অর্থাৎ, তাদের উক্তি তাদের আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلٰى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ -

অর্থাৎ, 'কোন কোন লোকের কথা পার্থিব জীবনে আপনাকে অবাক

করবে। সে তার মনের কথার উপর আল্লাহকে সাক্ষী করে; অথচ সে কঠোর তার্কিক। যখন সে প্রস্থান করে, তখন চেষ্টা করে পৃথিবীতে গোলযোগ সৃষ্টি করতে, শস্যক্ষেত্র বিনাশ করতে এবং প্রাণহানি ঘটাতে। আল্লাহ গোলযোগ পছন্দ করেন না।'

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ

অর্থাৎ, 'যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন ওরা বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন একান্তে যায়, তখন তোমাদের উপর ক্রোধে অঙ্গুলি চর্বণ করে।'

আরও বলা হয়েছে ঃ

يُرَاءُونَ النَّاسَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَا إِلٰى هٰؤُلَاءِ وَلَا إِلٰى هٰؤُلَاءِ -

অর্থাৎ, 'তারা লোক-দেখানো আমল করে। আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। তারা মানুষের মধ্যে দোদুল্যমান— না এই দলে, না ঐ দলে।'

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নিফাক অনেক বেশী ছিল। তখন কিছু লোক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে বাহ্যত মুসলমান হয়ে যেত। বর্তমানে এটা কম হলেও এর ধরন ও নমুনা অনেক রয়েছে। উদাহরণতঃ কিছু লোক ধর্মদ্রোহীদের উক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে মনে মনে দোযখ, জান্নাত ও কিয়ামত অস্বীকার করে অথবা শরীয়ত ও শরীয়তের বিধানাবলীকে বিধর্মীদের উক্তি অনুযায়ী অবশ্যপালনীয় মনে করে না। অথচ মুখে এর বিপরীত বর্ণনা করে। এ শ্রেণীর লোকও মুনাফিক ও রিয়াকার। এরা অনন্তকাল দোযখে থাকবে। কেননা, এর চেয়ে বড় কোন নিফাক নেই। এরা প্রকাশ্য কাফেরদের চেয়েও মন্দ। কারণ, কাফের বাইরেও শত্রু এবং ভিতরেও বেঈমান। কিন্তু এদের অবস্থা এই যে, এরা মুখে আল্লাহ আল্লাহ বলে এবং বগলে ছুরি লুকিয়ে রাখে।

দ্বিতীয় সোপান হচ্ছে মূল ঈমান স্বীকার করে মৌলিক এবাদত দ্বারা রিয়া করা। এ স্তরটিও আল্লাহ তা'আলার খুবই অপছন্দনীয়। এর দৃষ্টান্ত এই যে, এক ব্যক্তি জনসমাবেশে উপস্থিত রয়েছে, এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। সকলেই যখন নামায পড়ল, তখন সে-ও পড়ে নিল। অথচ একাকীত্বে নামায না পড়াই তার অভ্যাস। অথবা রমযান মাসে রোযা রাখল। কিন্তু যাতে রোযা রাখতে না হয়, সেজন্যে মানুষের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ার ইচ্ছা রাখে। অথবা জুমআর নামাযের জন্যে মসজিদে যায়; কিন্তু লোকের নিন্দার আশংকা না থাকলে কখনও যেত না। অথবা জেহাদ কিংবা হজ্জ কেবল মানুষের ভয়ে করে– মনের আগ্রহে নয়। এ ধরনের রিয়াকারের মধ্যে মূল ঈমান প্রতিষ্ঠিত থাকে। সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে উপাস্য মনে করে না। কেউ অন্য কিছুকে সেজদা করতে বললে সে করবে না। কিন্তু অলসতার কারণে আল্লাহর এবাদত করে না এবং জনসমাবেশে করলে খুশী হয়। অতএব, আল্লাহর কাছে মর্যাদা লাভের তুলনায় মানুষের কাছে মর্যাদা লাভ তার কাছে ভাল মনে হয়। তার কাছে মানুষের মন্দ বলার ভয় আল্লাহর আযাবের ভয়ের চেয়ে বেশী। মানুষের প্রশংসার প্রতি তার আগ্রহ আল্লাহর সওয়াবের প্রতি আগ্রহের তুলনায় বেশী। বলা বাহুল্য, এ ধরনের বিশ্বাস চরম মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। এরূপ ব্যক্তি মূল ঈমানে বিশ্বাসী হলেও আল্লাহর গযবে পতিত হওয়ার যোগ্য।

তৃতীয় সোপান হচ্ছে নফল ও মুস্তাহাব এবাদত দ্বারা রিয়া করা, যেগুলো বর্জন করলে কেউ গোনাহগার হয় না। কিন্তু একাকী থাকলে এর সওয়াব লাভ করতে সচেষ্ট হয় না এবং রিয়ার কারণে পালন করে। উদাহরণতঃ নামাযের জমাতে শরীক হওয়া, রোগীর কুশল জিজ্ঞাসা করা, জানাযায় শরীক হওয়া, রাতে তাহাজ্জুদ পড়া, আশূরার রোযা রাখা অথবা সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখা। রিয়াকাররা এসব এবাদত মানুষের নিন্দার ভয়ে এবং তাদের প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে পালন করে। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, একাকী হলে তারা ফরযসমূহের বেশী কিছু করত না। এ ধরনের রিয়াকার মন্দ হলেও পূর্ববর্তী সোপানসমূহের তুলনায় কম মন্দ।

এবাদতের গুণাবলীতে রিয়া করা হলে তারও তিনটি স্তর রয়েছে।

প্রথম স্তর হল এমন কাজে রিয়া করা, যা বর্জন করলে এবাদতে ত্রুটি দেখা দেয়। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি একাকী অবস্থায় নামায পড়লে দ্রুতগতিতে এবং কম সময়ে নামায সমাপ্ত করে নেয়; কিন্তু জনসমক্ষে নামায পড়লে রুকু-সেজদা উত্তমরূপে করে এবং সর্বাঙ্গীণ সুন্দর রূপে নামায আদায় করে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এরূপ করে, সে তার পরওয়ারদেগারকে হেয় প্রতিপন্ন করে। অর্থাৎ, নির্জন অবস্থায়ও যে আল্লাহ তা'আলা তার কর্ম সম্পর্কে অবহিত আছেন, সে বিষয়ে পরওয়া করে না।

পিপীলিকার চলনের চেয়েও গোপন রিয়া ঃ রিয়া দু' প্রকার– 'জলী' (প্রকাশ্য) ও 'খফী' (গোপন)। যে রিয়া সওয়াবের নিয়ত না থাকা সত্ত্বেও মানুষকে আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে, এটাই প্রকাশ্য রিয়া। এ প্রকার রিয়া দ্রুত বুঝা যায় এবং রিয়াকারও জেনে নেয় যে, সে রিয়া করছে। এর চেয়ে সামান্য গোপন সেই রিয়া, যা আমল করার কারণ তো হয় না; কিন্তু সওয়াবের নিয়তে যে আমলটি করা হয়, তা এই রিয়ার কারণে সহজ হয়ে যায়। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি প্রত্যহ তাহাজ্জুদ পড়ে; কিন্তু কিছুটা কষ্ট ও অবহেলার সাথে পড়ে। তবে বাড়ীতে কোন মেহমান আগমন করলে তাহাজ্জুদ পড়া তার জন্যে সহজ ও আনন্দের কাজ হয়ে যায়। সে এটাও জানে যে, সওয়াবের আশা না থাকলে কেবল এই মেহমানকে দেখানোর জন্যে সে তাহাজ্জুদ পড়ত না।

এরচেয়েও অধিক গোপন সেই রিয়া, যা আমলের কারণও হয় না এবং আমলকে সহজও করে না। এতদসত্ত্বেও তা অন্তরে লুক্কায়িত থাকে। আমলের উপর এর কোন প্রভাব নেই বিধায় আলামত ছাড়া একে জানাও সম্ভবপর নয়। এর সবচেয়ে সুস্পষ্ট আলামত এই যে, এই রিয়াকারের আমল সম্পর্কে মানুষ অবগত হলে সে খুশী হয়। যেমন, অনেক আবেদ রয়েছে, যারা নিষ্ঠা সহকারে এবাদত করে এবং রিয়ায় বিশ্বাস করে না; বরং একে খারাপ মনে করে। কিন্তু যখন তাদের এবাদত সম্পর্কে মানুষ অবগত হয়, তখন তারা আনন্দ অনুভব করে— যেন এবাদতে পরিশ্রম করার একটি বোঝা অন্তর থেকে নেমে গেল। বলা বাহুল্য, একটি গোপন রিয়া থেকেই এই আনন্দের উৎপত্তি। কারণ, অন্তর যদি মানুষের দিকে

ভ্রূক্ষেপ না করত, তবে মানুষের অবগত হওয়ার কারণে এই আনন্দ কখনও হত না। অতএব জানা গেল যে, পাথরে যেমন আগুন লুকিয়ে থাকে, তেমনি এই রিয়াও অন্তরে প্রচ্ছন্ন ছিল, যার মধ্যে মানুষের অবগতি চকমকি পাথরের কাজ করেছে এবং আনন্দের চিহ্ন ফুটিয়ে তুলেছে। এরপর এই অবগতি থেকে উদ্ভূত আনন্দের স্বাদ যদি আবেদ গ্রহণ করে এবং ঘৃণা দ্বারা ক্ষতিপূরণ না করে, তবে এ আনন্দই গোপন রিয়ার শক্তি ও খাদ্য হয়ে যায়।

এরচেয়েও অধিক গোপন সেই রিয়া, যাতে মানুষের অবগতির খাহেশও থাকে না এবং এবাদত প্রকাশ পেলে আনন্দও হয় না; কিন্তু এতদসত্ত্বেও এটা ভাল মনে হয় যে, মানুষ তাকে দেখামাত্রই প্রথমে সালাম করুক, সসম্ভ্রম ব্যবহার করুক, তার কাজে সন্তুষ্ট থাকুক এবং কেনাবেচায় তার খাতির করুক। এসব ব্যাপারে কেউ ত্রুটি করলে সেটা তার কাছে দুঃসহ কষ্টের কারণ ও অবাস্তব মনে হয়। এমতাবস্থায় সে যেন এই সম্মান ও সম্ভ্রম সেই এবাদতের কারণেই চায়, যা সে গোপনে করে এবং কাউকে জানায় না। পূর্বে এই এবাদত না করলে সম্মান প্রদর্শনে মানুষের ত্রুটি তার কাছে অবাস্তব মনে হত না। সুতরাং এ ধরনের এবাদতে আবেদ কেবল আল্লাহ তা'আলার অবগতিতে সন্তুষ্ট থাকে না বিধায় তার সাথে গোপন রিয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়, যা পিপীলিকার চলন থেকেও অধিক গোপন। এই রিয়া যদি সওয়াব বরবাদ করে দেয়, তবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সিদ্দীকগণ ছাড়া কেউ এই রিয়া থেকে বাঁচতে পারে না। সওয়াব বরবাদ করার দলীল হযরত আলী (রাঃ)-এর এই উক্তি- কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ক্বারীগণকে বলবেন ঃ তোমাদের জন্যে লোকেরা কি পণ্যদ্রব্যের দাম সস্তা করত না? তোমাদেরকে কি প্রথমে সালাম করত না? তোমাদের অভাব-অনটন কি দূর করত না? অতএব, আজ তোমাদের জন্যে কোন পুরস্কার নেই। তোমাদের পুরস্কার তোমরা দুনিয়াতেই আদায় করে নিয়েছ।

এখন প্রশ্ন হয়, এবাদত প্রকাশ হয়ে পড়লে আনন্দিত হয় না- এমন লোক আমরা দেখি না; বরং এ ব্যাপারে প্রত্যেক এবাদতকারীই কিছু না কিছু আনন্দ অনুভব করে। অতএব, সকল প্রকার আনন্দই কি নিন্দনীয়, না

কিছু নিন্দনীয় ও কিছু প্রশংসনীয় আছে? এ প্রশ্নের জওয়াব এই যে, সকল প্রকার আনন্দই নিন্দনীয় নয়; বরং এবাদত প্রকাশ হয়ে পড়ার আনন্দ পাঁচ প্রকার হতে পারে। তন্মধ্যে চার প্রকার ভাল এবং এক প্রকার মন্দ। ভাল চার প্রকারের প্রথম প্রকার এই যে, এবাদত গোপন ও একনিষ্ঠ থাকুক- এটাই আবেদের কাম্য। কিন্তু প্রকাশ হয়ে পড়ার পর আবেদ এই ভেবে আনন্দিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি কৃপা ও সদয় ব্যবহার করতে চান। তাই আমার গোনাহসমূহ গোপন করেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করে দেন। আমার ইচ্ছা ছিল গোনাহ ও আনুগত্য উভয়টি গোপন থাকুক। অতএব এরচেয়ে বড় কৃপা আর কি হবে যে, তিনি গোনাহকে ঢেকে রেখেছেন এবং এবাদতকে প্রকাশ করে দিয়েছেন। আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের কথা ভেবে আবেদের এহেন আনন্দ খারাপ নয়; বরং উত্তম। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا

অর্থাৎ, 'বলুন, আল্লাহর কৃপায় ও রহমতে। অতএব এতেই আনন্দিত হওয়া উচিত।'

এ আনন্দের কারণ এই হল যে, আবেদ জানতে পারল সে আল্লাহ তা'আলার একজন প্রিয় বান্দা।

দ্বিতীয় প্রকার এই ভেবে আনন্দিত হওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যেমন আমার গোনাহ ঢেকে রেখেছেন এবং এবাদত প্রকাশ করে দিয়েছেন, তেমনি আখেরাতেও করবেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

مَاسَتَرَ اللّٰهُ عَلٰى عَبْدٍ ذَنْبًا فِى الدُّنْيَا اِلَّاسَتَرَهٗ عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرَةِ -

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যে গোনাহ গোপন রাখেন, আখেরাতেও তাই গোপন রাখেন।'

অতএব, এ আনন্দের কারণ হচ্ছে ভবিষ্যতে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার আশা।

তৃতীয় প্রকার এই ভেবে আনন্দিত হওয়া যে, এই আনুগত্য প্রকাশ হয়ে পড়লে মানুষ আমার অনুসরণ করবে এবং এমনি ধরনের আনুগত্য করবে। ফলে আমার সওয়াব আরও বেড়ে যাবে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— যে ব্যক্তি কোন সওয়াবের কাজ করে এবং মানুষ তার অনুসরণ করে, সে অনুসারীদের সমান সওয়াব পেতে থাকে এবং তাদের সওয়াব হ্রাস করা হয় না। বলা বাহুল্য, সওয়াব বৃদ্ধির আশা করা আনন্দদায়ক। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবাদতকে গোপন করার সওয়াবও পাবে এবং পরে প্রকাশ হয়ে পড়ার কারণেও সওয়াব পাবে।

চতুর্থ প্রকার এই ভেবে আনন্দিত হওয়া যে, যারা তার এবাদত সম্পর্কে অবগত হয়ে তার প্রশংসা করেছে, তারা আল্লাহ তা'আলার মরযী ও পছন্দ অনুযায়ী কাজ করেছে। কারণ, তারা তাঁর অনুগত বান্দাকে প্রিয়পাত্র মনে করেছে। এতে বুঝা যায়, তাদের মন-মেজায আনুগত্যপ্রবণ। নতুবা কতক ঈমানদার এমনও রয়েছে, যারা এবাদতকারীদেরকে দেখলে হিংসা করে, নিন্দা করে এবং রিয়াকার আখ্যা দিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। সুতরাং প্রশংসা দ্বারা জানা গেল যে, প্রশংসাকারীদের ঈমান সঠিক। এক্ষেত্রে এবাদতকারীর আন্তরিকতার আলামত এই যে, মানুষ অন্য কোন এবাদতকারীর প্রশংসা করলেও সে ততটুকুই আনন্দিত হয়, যতটুকু নিজের প্রশংসার কারণে হয়।

পঞ্চম প্রকার আনন্দ যা মন্দ, তা হচ্ছে এই ভেবে আনন্দিত হওয়া যে, এবাদতের কারণে মানুষের মনে আমার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ফলে, তারা আমার তারীফ ও তাযীম করতে শুরু করেছে, উঠাবসায় আমাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং আমার প্রয়োজনে সহায়তা করছে। এবাদতকারীর এই প্রকার আনন্দ নিঃসন্দেহে গর্হিত।

গোপন ও প্রকাশ্য রিয়ার মধ্যে যেগুলো বাতিল ঃ জানা উচিত যে, বান্দা যখন কোন এবাদতকে এখলাস তথা আন্তরিকতা সহকারে সম্পন্ন করে, এরপর তার মধ্যে রিয়া আসে, তখন এই রিয়া হয় এবাদত শেষ করার পরে, না হয় আগে, না হয় এবাদতের সাথে সাথে আসবে। যদি এবাদত শেষ করার পর কেবল তা প্রকাশ হয়ে পড়ার আনন্দ হয় এবং নিজে প্রকাশ না করে, তবে এই আনন্দ এবাদতকে বাতিল করবে না। কেননা, এবাদত তো রিয়া ছাড়াই এখলাস সহকারে সমাপ্ত হয়ে গেছে।

পরবর্তীতে যে রিয়া হবে, তার প্রভাব আশা করা যায় এবাদত পর্যন্ত পৌঁছবে না। বিশেষত যখন এবাদতকারী নিজে তা প্রকাশ করেনি; বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রকাশ করার কারণে প্রকাশ হয়ে গেছে। হাঁ, যদি রিয়া ছাড়াই এবাদত সম্পন্ন হয়, কিন্তু এবাদতকারী পরে তা সাগ্রহে প্রকাশ করে দেয়, তবে এতে ভয়ের কারণ আছে এবং হাদীস ও মনীষীদের উক্তি থেকে জানা যায় যে, এটা এবাদতকে বাতিলও করে দেবে। সেমতে হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ আমি কাল রাতে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করেছি। তিনি বললেন ঃ এই এবাদতে এই ব্যক্তির অংশ এতটুকুই।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে জনৈক ব্যক্তি আরয করল ঃ আমি সারা জীবন রোযা রেখেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি রোযাও রাখনি এবং রোযাহীন অবস্থায়ও জীবন অতিবাহিত করনি। কেউ কেউ এই উক্তির কারণ এটাই বর্ণনা করেন যে, লোকটি তার এবাদত প্রকাশ করে দিয়েছিল। কারও মতে এর কারণ এই ছিল যে, সারা জীবন রোযা রাখা অপছন্দনীয়।

মোটকথা, রসূলে করীম (সাঃ) ও হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর উক্তি একথা জ্ঞাপন করে যে, এবাদত করার সময় লোকটির অন্তর রিয়া থেকে মুক্ত ছিল না। তাই সে নিজে বলে তা প্রকাশ করে দিয়েছে। যে রিয়া এবাদতের পরে প্রকাশ পায়, তা এবাদতের সওয়াব বাতিল করে দেবে—এটা অবশ্য কিয়াস তথা অনুমানের খেলাফ। কিয়াস বলে, রিয়ার পূর্বে সম্পন্ন আমলের সওয়াব সে পাবে এবং আমলের পরে যে রিয়া অস্তিত্ব লাভ করে, তার কারণে শাস্তি পাবে।

যদি কেউ এখলাস সহকারে নামায আদায় করে; কিন্তু আদায় করার সময় কিছু রিয়াও হয়ে যায়, তবে নামাযের সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি যখন নফল নামায পড়ছিল, তখন তার কাছে কিছু দর্শক আগমন করল অথবা কোন বাদশাহ আগমন করল। ফলে তার মনে বাসনা দেখা দিল যে, আগন্তুকরা তাকে দেখুক। অথবা নামাযের মধ্যে কোন বিস্মৃত বস্তু স্মরণ হল এবং তা তালাশ করার বাসনা জাগ্রত হল। এমনকি, লোকজন না থাকলে নামায ছেড়ে দিয়েই তা তালাশ করতে প্রবৃত্ত

হত। কেবল লোকনিন্দার ভয়েই নামায পূর্ণ করল। এমতাবস্থায় তার নামাযের সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে। ফরয নামাযে এরূপ হলে সেই ফরয নামায পুনরায় আদায় করা উচিত। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে—

اَلْعَمَلُ كَالْوِعَاءِ اِذَا طَابَ اٰخِرُهٗ طَابَ اَوَّلُهٗ

অর্থাৎ, 'আমল পাত্রের মত। তার শেষ ভাল হলে শুরুও ভাল হবে।'

এতে বুঝা গেল যে, সমাপ্তি পর্যন্ত ভাল করা জরুরী। এক রেওয়ায়েতে আছে— যে ব্যক্তি তার আমলে এক মুহূর্ত রিয়া করবে, তাঁর পূর্ব আমল বাতিল হয়ে যাবে। এ রেওয়ায়েতটি কেবল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য— সদকা ও তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে নয়। কেননা, সদকা ও তেলাওয়াতের প্রত্যেকটি অংশ আলাদা। সুতরাং যে অংশে রিয়া হবে, তা এবং তার পরবর্তী অংশ বাতিল হবে—পূর্ববর্তী অংশ বাতিল হবে না।

যদি কেউ নামাযের নিয়ত করার সাথে সাথে রিয়ার ইচ্ছা করে এবং তা সালাম ফিরানো পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, তবে তার নামায মূল্যহীন। সর্ব সম্মতিক্রমে এরূপ নামায মূল্যহীন। এ নামাযের কাযা করা উচিত। আর যদি নামায শেষ হওয়ার পূর্বেই নামাযের মধ্যে অনুতপ্ত হয়ে এস্তেগফার করে এবং রিয়া বর্জন করে, তবে তার নামায সম্পর্কে তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। (১) কেউ কেউ বলেন ঃ সে রিয়ার ইচ্ছা সহকারে নামায শুরু করেছিল বিধায় তার নামাযই হয়নি। তাই নতুনভাবে নিয়ত করা দরকার। (২) কারও মতে এরূপ ব্যক্তির নিয়ত ঠিক থাকবে এবং রুকূ, সেজদা ইত্যাদি ক্রিয়াকর্ম শুদ্ধ হবে না। তাই রুকূ-সেজদা পুনরায় করতে হবে। (৩) আবার অনেকে বলেন, এরূপ ব্যক্তির পুনরায় কোন কিছু করতে হবে না; বরং সে মনে মনে এস্তেগফার করে এখলাস সহকারে নামায খতম করবে। কেননা, শেষ অবস্থাটিই ধর্তব্য। যদি এখলাস সহকারে নামায শুরু করত এবং রিয়ার উপর শেষ করত, তবে নামায বাতিল হয়ে যেত। এখানে এর বিপরীত হয়েছে; অর্থাৎ রিয়া দ্বারা শুরু করে এখলাসের উপর শেষ করা হয়েছে। সুতরাং নামায বাতিল না হওয়া উচিত। এটা এমন, যেমন কোন পাক-সাফ কাপড়ে নাপাকী লেগে গেল। এরপর সেই নাপাকী দূর করা হল। এমতাবস্থায় কাপড়টি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।

আমাদের মতে পূর্বোক্ত দুটি উক্তিই কেফাহর দৃষ্টিকোণ থেকে বাতিল। বিশেষত যারা বলে যে, শুধু রুকূ-সেজদা পনুরায় করে নেবে--তাকবীরে তাহরীমার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। কেননা, রুকূ-সেজদা শুদ্ধ না হলে এগুলোকে নামাযে অতিরিক্ত কাজ বলে গণ্য করতে হবে, যা নামাযকে ফাসেদ করে দেয়। তৃতীয় উক্তিটিও অগ্রাহ্য। কেননা, শুরুতে রিয়া থাকার কারণে নিয়ত ক্রটিযুক্ত হয়ে যায়।

অতএব, ফেকাহর দৃষ্টিকোণ থেকে যে বিষয়টি শুদ্ধ, তা এই যে, যদি এই নামাযের প্রেরণাদাতা শুধু রিয়া হয়—সওয়াব অন্বেষণ না হয়, তবে তাহরীমাই শুদ্ধ হবে না। সুতরাং এর পরে যা যা করবে, তার কোনটিই শুদ্ধ হবে না। মনে করুন, এক ব্যক্তি একা থাকলে নামায পড়ত না; কিন্তু জনসমাবেশ দেখে নিয়ত বেঁধে নিল। তার এই নামাযে নিয়তই নেই। কেননা, নিয়ত সেই ইচ্ছাকে বলা হয়, যার প্রেরণাদাতা হয় ধর্মের আদেশ পালন। এখানে এই প্রেরণাদাতা নেই। হাঁ, যদি অবস্থা এমন হত যে, জনসমাবেশ না থাকলেও নামায পড়ত; কিন্তু জনসমাবেশ থাকার কারণে তাদের ভাল বলারও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়ে গেছে, তবে এক্ষেত্রে দুটি প্রেরণাদাতা একত্রিত হয়—ধর্মের আদেশ পালন এবং মানুষের ভাল বলার আকাঙ্ক্ষা। এখানে যে পরিমাণে নিয়ত শুদ্ধ হবে, সে পরিমাণে সওয়াব পাওয়া যাবে এবং যে পরিমাণে নিয়ত ফাসেদ হবে, সেই পরিমাণে আযাব। একটির উপস্থিতিতে অপরটি নিষ্ফল হবে না।

নিয়তে ক্রটির কারণে যে নামায ফাসেদ হয়ে যায়, তা যদি নফল নামায হয়, তবে তার বিধান সদকার অনুরূপ। অর্থাৎ, এটা একদিক দিয়ে আনুগত্য এবং একদিক দিয়ে নাফরমানী। কেননা, এরূপ নামাযীর অন্তরে ভাল ও মন্দ দুটি প্রেরণাদাতা বিদ্যমান। সুতরাং এরূপ বলা যায় না যে, তার নামায শুদ্ধ নয় এবং তার এক্তেদাও শুদ্ধ নয়। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি তারাবীহর নামায আদায় করল এবং অবস্থার ইঙ্গিত দ্বারা জানা গেল যে, তার ইচ্ছা কেবল সুন্দর কেরাআত যাহির করাই ছিল। যদি জামাত না হত এবং সে তার গৃহে একা থাকত, তবে তারাবীহ পড়ত না। এখানে এটা বলা যায় না যে, এই ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া দুরস্ত নয়। তার সম্পর্কে

এরূপ ধারণা করা অবান্তর; বরং মুসলমান সম্পর্কে এ ধারণাই করতে হবে যে, সে নফল নামায দ্বারা সওয়াবের ইচ্ছা রাখে। এই ইচ্ছার দিক দিয়ে তার নামাযও শুদ্ধ এবং তার পিছনে নামায পড়াও জায়েয, যদিও সওয়াবের ইচ্ছার সাথে অন্য ইচ্ছাও যুক্ত হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে যদি ফরয নামাযে দুই প্রেরণাদাতা একত্রিত হয় এবং উভয়টি মিলে নামায আদায় করার কারণ হয়, তবে নামাযী ফরয থেকে মুক্ত হবে না। কেননা, ফরযের প্রেরণাদাতাটি তার মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায়নি।

কোন্ কোন্ স্থানে এবাদত প্রকাশ করা জায়েয ঃ প্রকাশ থাকে যে, এবাদত গোপন রাখার মধ্যে যেমন এখলাস অবলম্বন এবং রিয়া থেকে আত্মরক্ষার উপকারিতা রয়েছে, তেমনি প্রকাশ করার মধ্যেও উপকারিতা নিহিত আছে। তা হচ্ছে মানুষের অনুসরণ করা এবং তাদের মধ্যে সৎকাজের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া। কিন্তু এতে রিয়ারও বিপদ আছে। হযরত হাসান (রাঃ) বলেন ঃ সকল মুসলমান জানে যে, এবাদত গোপন রাখার মধ্যে অনেক সাবধানতা কিন্তু প্রকাশ করার মধ্যেও ফায়দা আছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা গোপন এবাদত ও প্রকাশ্য এবাদত উভয়ের প্রশংসা করে বলেন ঃ

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ -

অর্থাৎ, 'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা খুব ভাল কথা। আর যদি গোপনে ফকীরদেরকে দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে উত্তম।'

এবাদত প্রকাশ করা দ্বিবিধ উপায়ে হয়ে থাকে। এক, আসল এবাদতকে প্রকাশ করা এবং দুই, এবাদত করার পর তা মানুষের কাছে বলে দেয়া। প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত যেমন জনসমক্ষে খয়রাত করা, যাতে মানুষও খয়রাত করতে উৎসাহিত হয়। বর্ণিত আছে যে, জনৈক আনসারী

সর্বাগ্রে একটি টাকার থলে দান করেন। এরপর অন্যরা তার দেখাদেখি দান করতে থাকে। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنِ اتَّبَعَهُ

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি সৎকর্মের প্রচলন করে, এরপর মানুষ তা করে, সে সেই সৎকর্মের সওয়াব এবং যারা এর অনুসরণ করে তাদের সওয়াব পাবে।'

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি এবাদতের অবস্থাও তাই। কিন্তু দান-খয়রাতে মানুষ একে অপরের অধিক অনুসরণ করে থাকে। গাযী যখন জেহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন সর্বপ্রথম সওয়ারী প্রস্তুত করবে, যাতে অন্যরাও উৎসাহিত হয়। এটা উত্তম। কেননা, জেহাদে যাওয়া মূলত বাহ্যিক ও প্রকাশ্য এবাদত। এটা গোপনে করা সম্ভব নয়। এমনিভাবে মানুষ মাঝে মাঝে সজোরে তাহাজ্জুদ পড়ে, যাতে গৃহের অন্যরা জেগে উঠে এবং তার অনুসরণ করে। মোটকথা, হজ্জ, জেহাদ, জুমআ ইত্যাদির মত যে সকল এবাদত গোপনে পালন করা সম্ভব নয়, সেগুলো রিয়ার মিশ্রণ না থাকার শর্তে প্রকাশ্যে পালন করা উত্তম। পক্ষান্তরে যে সকল এবাদত গোপনে করা সম্ভব যেমন দান-খয়রাত, সেগুলো প্রকাশ্যে পালন করলে যদিও অপরকে উৎসাহিত করা হয় কিন্তু মিসকীন ব্যথা পায়, তাই গোপনে দান-খয়রাত করাই উত্তম। কেননা, মিসকীনকে ব্যথা দেয়া হারাম। যদি মিসকীন ব্যথা না পায়, তবু কারও কারও মতে গোপনে দেয়াই উত্তম এবং কারও মতে গোপনে দেয়া সেই প্রকাশ্যে দেয়ার চেয়ে উত্তম, যার মধ্যে অপরের অনুসরণ নেই। কিন্তু যে প্রকাশ্যে দেয়ার মধ্যে অপরের অনুসরণ আছে, তা প্রকাশ্যে দেয়াই উত্তম। কেননা, আল্লাহ পাক পয়গম্বরগণকে প্রকাশ্যে আমল করারই আদেশ করেছেন, যাতে অন্যরা তাঁদের অনুসরণ করে। এছাড়া لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا (সে তার নেকীর সওয়াব এবং যে অনুসরণ করে, তার সওয়াব পাবে)—এই হাদীস দ্বারাও প্রকাশ্যে আমল করার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

এক হাদীসে বলা হয়েছে—গোপন আমলের সওয়াব প্রকাশ্য আমলের তুলনায় সত্তর গুণ বেশী। কিন্তু যে প্রকাশ্য আমলের অন্যরা অনুসরণ করে, তার সওয়াব গোপন আমলের তুলনায় সত্তর গুণ বেশী। এই হাদীস সম্পর্কে মতানৈক্যের অবকাশ নেই। কেননা, অন্তর রিয়ার মিশ্রণ থেকে মুক্ত হলে এবং প্রকাশ্য ও গোপন উভয় অবস্থায় আমল এখলাস সহকারে সম্পন্ন হলে প্রকাশ্য আমলই নিঃসন্দেহে উত্তম হবে। কারণ, এতে অপরের অনুসরণ অর্জিত হবে। প্রকাশ্যে আমল করার একমাত্র ভয় হচ্ছে রিয়া। যদি রিয়ার মিশ্রণ থাকে, তবে নিজে ধ্বংস হয়ে অপরের অনুসরণে কোন ফায়দা নেই। এমতাবস্থায় প্রকাশ্যে আমল করার তুলনায় গোপনে আমল করা সকলের মতে উত্তম।

কিন্তু যে ব্যক্তি আমলকে প্রকাশ করতে চায়, তার দুটি বিষয় ভেবে নেয়া উচিত। প্রথম, এমন জায়গায় প্রকাশ করতে হবে, যেখানে অপরের অনুসরণের নিশ্চিত অথবা প্রবল বিশ্বাস থাকে। দ্বিতীয়, অন্তরের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যেন তাতে গোপন রিয়ার প্রতি মহব্বত না থাকে এবং এরই কারণে অনুসরণের ছলে আমল প্রকাশ না করে।

মোটকথা, নফসের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত। প্রকাশ্য আমল খুব কম বিপদমুক্ত হয়ে থাকে। আমল গোপনে করার মধ্যেই নিরাপত্তা নিহিত। আমল প্রকাশ করার মধ্যে এমন বিপদাশংকা রয়েছে, যা অতিক্রম করার ক্ষমতা আমাদের মত লোকদের মধ্যে নেই। সুতরাং আমাদের এবং সকল দুর্বলমনাদের উচিত প্রকাশ্যে আমল করাকে ভয় করা।

গোপনে আমল সম্পন্ন করার পর তা মানুষের কাছে বলে দেয়াও কম বিপজ্জনক নয়, এর বিধানও প্রকাশ্যে আমল করার অনুরূপ। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মযবুত মন ও পূর্ণ এখলাসের অধিকারী এবং মানুষের নিন্দা ও প্রশংসা যার কাছে সমান, সে এমন লোকদের কাছে আপন আমলের কথা ব্যক্ত করতে পারে, যাদের দিক থেকে অনুসরণ আশা করা যায় এবং সৎকাজের প্রতি আগ্রহ জানা যায়। নিয়ত পরিষ্কার এবং মন বিপদমুক্ত হলে এরূপ প্রকাশ করা জায়েয; বরং মোস্তাহাব। পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে এ

ধরনের প্রকাশ করার কথা বর্ণিত আছে। সেমতে হযরত সাদ ইবনে মুয়ায বলেন ঃ আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে এমন কোন নামায পড়িনি, যাতে নামায ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা আমার মনে উদিত হয়েছে এবং এমন কোন জানাযার পিছনে যাইনি, যাতে তার সওয়াল-জওয়াব ছাড়া অন্য কিছু মনে মনে ভেবেছি। আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছ থেকে যখনই কোন কথা শুনেছি, তাকে সত্য বলেই বিশ্বাস করেছি।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি কখনও এ বিষয়ের পরওয়া করি না যে, আমি ধনী না গরীব। কেননা, ধনাঢ্যতা ও দরিদ্রতার মধ্যে কোন্‌টি আমার জন্যে মঙ্গলজনক, তা আমার জানা নেই। হযরত উসমান (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে বয়াত হওয়ার পর থেকে আমি কখনও যিনা করিনি, মিথ্যা বলিনি এবং ডান হাতে আপন লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি। নিঃসন্দেহে এসব রেওয়ায়েত নিজের উত্তম অবস্থা প্রকাশ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। প্রকাশকারী অনুসৃত ব্যক্তিত্ব হওয়ার শর্তে এরূপ প্রকাশ করা উত্তম। পক্ষান্তরে রিয়াকারের মুখ থেকে এসব কথা ঘৃণ্য রিয়াকারী ছাড়া কিছুই নয়। অতএব, আমল প্রকাশ করার দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ করা সমীচীন নয়। কেননা, মানুষের মন দেখাদেখি কাজ করা ও অনুসরণ করা পছন্দ করে। এটা তার মজ্জার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এমনকি, রিয়াকারও যদি তার এবাদত প্রকাশ করে এবং মানুষ তার রিয়া না জানে, তবে এতেও মানুষের অনেক উপকার হয়ে থাকে। কিন্তু এটা বিশেষ করে তার নিজের জন্যে ক্ষতিকর। অনেক এখলাস সম্পন্ন ব্যক্তির এখলাসের কারণ রিয়াকারের অনুসরণ হয়ে থাকে। যদিও সে আল্লাহর কাছে রিয়াকার; কিন্তু তার অনুসরণ দ্বারা অপরের উপকার হয়ে যায়।

এক সময় বসরার অলিগলি দিয়ে ফজরের নামাযের পর কেউ গমন করলে সে চতুর্দিক থেকে কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেত। কিন্তু যখন জনৈক আলেম রিয়ার সূক্ষ্ম বিষয়াদি নিয়ে একটি পুস্তক রচনা করলেন, তখন সকলেই তেলাওয়াত বর্জন করল এবং তারা বলতে লাগল ঃ এ গ্রন্থটি রচিত না হলেই ভাল হত। মোটকথা, রিয়াকারের প্রকাশ করা দ্বারাও উপকার হয় যদি মানুষ না জানে যে, সে রিয়ার কারণে আমল করছে। এ সম্পর্কে একটি হাদীসে বলা হয়েছে—

إِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ وَبِأَقْوَامٍ لَّاخَلَاقَ لَهُمْ

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা পাপাচারী ব্যক্তি এবং ভূমিকাহীন ব্যক্তিবর্গ দ্বারা ইসলামকে শক্তি যোগান।'

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত রিয়াকারও এই হাদীসের প্রতীক।

রিয়ার **ভয়ে সৎকর্ম বর্জন করা** ঃ কোন কোন লোক রিয়াকার হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমলই বর্জন করে বসে। এটা তাদের ভ্রান্তি এবং শয়তানের সাথে সহযোগিতা। জানা দরকার যে, আমল দু'প্রকার। প্রথম, যার মধ্যে কোন আনন্দ নেই; বরং আছে শুধু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ও জেহাদ। এসব আমল এদিক দিয়ে আনন্দদায়ক হয় যে, এগুলোর মাধ্যমে মানুষের প্রশংসা অর্জিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার সেসব আমল, যেগুলো স্বয়ং আনন্দদায়ক। এগুলোর মধ্যে অধিকাংশই দেহের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সর্বসাধারণের সাথে সম্পৃক্ত; যেমন খলীফা হওয়া, বিচারপতি হওয়া, শাসক হওয়া, নামাযের ইমাম হওয়া, উপদেশদাতা ও শিক্ষক হওয়া ইত্যাদি। জনগণের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে এসব আমলের মধ্যে বিপদাপদ বেশী।

প্রথম প্রকার আমল অর্থাৎ নামায, রোযা ও জেহাদের মধ্যে ত্রিবিধ উপায়ে রিয়ার আশংকা থাকে। প্রথম, রিয়া আমলের পূর্বে আসে এবং মানুষকে দেখানোর জন্যে আমল শুরু করা হয়। কোন ধর্মীয় কারণ এর সাথে থাকে না। রিয়ার ভয়ে এরূপ আমল বর্জন করা উচিত। কেননা, এটা পরিষ্কার গোনাহ। এতে এবাদত নেই; বরং এটা এবাদতের ছদ্মাবরণে মানুষের মধ্যে মর্যাদা লাভের অপচেষ্টা। দ্বিতীয়, আমল আল্লাহর জন্যেই করতে প্রস্তুত থাকার পর মাঝখানে অথবা শুরুতে রিয়া আসা। এমতাবস্থায় আমল বর্জন করা উচিত নয়। কেননা, এতে ধর্মীয় কারণ পাওয়া যায়। এখানে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে রিয়া দূর করা দরকার। তৃতীয়, এখলাস সহকারে আমলের নিয়ত করা, অতঃপর রিয়া ও রিয়ার কারণসমূহ আমল সম্পাদন করার সময় আত্মপ্রকাশ করা। এমতাবস্থায়ও রিয়া দূর করার জন্যে অধ্যবসায় জরুরী এবং আমল বর্জন করা অসমীচীন। কেননা,

শয়তান প্রথমে এটাই চায় যে, মানুষ আমল না করুক। যদি কেউ শয়তানকে অমান্য করে আমল শুরু করে দেয়, তবে শয়তান তাকে রিয়ার দিকে আকৃষ্ট করে। কেউ এটাও উপেক্ষা করলে শয়তান বলে ঃ তোর আমলে এখলাস নেই। তুই রিয়াকার। এখলাসহীন আমল দ্বারা তোর কোন উপকার হবে না। শয়তান এ কথাটি উপর্যুপরি বলে যেতে থাকে যে পর্যন্ত সে আমল বর্জন না করে।

সারকথা, যে পর্যন্ত আমলের প্রেরণাদাতা ধর্ম হয়, সে পর্যন্ত আমল বর্জন করবে না; বরং যথাসম্ভব রিয়ার কুমন্ত্রণাকে দূর করবে এবং মনে মনে আল্লাহ তা'আলার কাছে লজ্জিত হবে।

মানুষের কাছে খ্যাত হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমল বর্জন করার নযীর পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ থেকে বর্ণিত আছে। এক রেওয়ায়েতে আছে, ইবরাহীম নখয়ী একবার তেলাওয়াতে রত ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তার খেদমতে আগমন করল। তিনি কোরআন বন্ধ করে তেলাওয়াত মওকুফ করে বললেন ঃ আগন্তুক যেন না জানে যে, আমি প্রতিনিয়ত তেলাওয়াত করি। ইবরাহীম তায়মী বলেন ঃ যখন কথা বলা তোমার কাছে প্রীতিকর মনে হয়, তখন চুপ করে থাকবে এবং যখন চুপ থাকা সুখকর মনে হয়, তখন কথা বলবে। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ কোন কোন বুযুর্গ পথিমধ্যে কষ্টদায়ক বস্তু পড়ে থাকতে দেখেও খ্যাতির ভয়ে সেটি সরাতেন না। কেউ কেউ ভাবাবেগে কান্না এলে সেটিকে হাসিতে রূপান্তরিত করে দিতেন। এ সম্পর্কে এমনি ধরনের আরও অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এগুলোর জওয়াব এই যে, আমল বর্জনের রেওয়ায়েতসমূহের মোকাবিলায় আমল অব্যাহত রাখার রেওয়ায়েত অসংখ্য বুযুর্গ থেকে বিদ্যমান আছে। এছাড়া নফল আমল হলে তা বর্জন করা জায়েয।

দ্বিতীয় প্রকার আমল যা সর্বসাধারণের সাথে সম্পৃক্ত, তাতে রিয়ার বিপদাশংকা অধিক। বলা বাহুল্য, সর্বাধিক বিপদাশংকা খেলাফতের মধ্যে, এরপর শাসক হওয়ার মধ্যে, এরপর উপদেশ, শিক্ষকতা ও ফতোয়াদানের মধ্যে। অতএব, প্রত্যেকটি বিশদভাবে জানা দরকার।

খেলাফতের অর্থ হচ্ছে মুসলমান জনগণের নেতা হওয়া। এটা ইনসাফ

ও এখলাস সহকারে হলে উত্তম এবাদত। হাদীসে বলা হয়েছে—

عبادة اليوم من امام عادل خير من عبادة الرجل وحده ستين عاما

অর্থাৎ, 'ন্যায়পরায়ণ খলীফার একদিনের এবাদত এক ব্যক্তির একাকী ষাট বছর এবাদতের চেয়ে উত্তম।'

অতএব এরচেয়ে বেশী এবাদত আর কি হবে, যার একদিন ষাট বছরের এবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। অন্য হাদীসে আছে—

اول من يدخل الجنة ثلاثة الامام المقسط احدهم

অর্থাৎ, 'সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। ন্যায়পরায়ণ খলীফা তাদের একজন।

হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে আছে—

ثلاثة لاترد دعوتهم الامام العادل احدهم

অর্থাৎ, 'তিন ব্যক্তির দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না। ন্যায়পরায়ণ শাসক তাদের একজন।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন—

اقرب الناس مني مجلسا يوم القيامة امام عادل

অর্থাৎ, 'কিয়ামতের দিন আমার অধিক নিকটে বসবে ন্যায়পরায়ণ শাসক।'

মোটকথা, খেলাফত একটি মহান এবাদত। এতে বিপদাশংকা অধিক বিধায় খোদাভীরু ব্যক্তিগণ সর্বকালেই এ থেকে দূরে রয়েছেন। কেননা, এর কারণে মনের মধ্যে যশপ্রীতি এবং জয়ী হওয়ার আনন্দ প্রবল হয়ে যায়, যা জাগতিক আনন্দসমূহের অন্যতম। শাসক ব্যক্তি সাধারণত তার মানসিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হয়। ফলে, আপন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে সে সত্য বিষয়কেও বর্জন করতে পারে— যদি তা তার যশপ্রীতির প্রতিকূল হয়। পক্ষান্তরে যে বিষয়ে যশ বেশী, তা বাতিল হলেও

বাস্তবায়িত করতে পারে এবং ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এহেন বিপদাশংকার কারণেই হযরত উমর (রাঃ) বলতেন ঃ এই পদে যখন এত বিপদ, তখন এটি কে গ্রহণ করতে পারে? রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

ما من والي عشرة الا جاء يوم القيامة مغلولة يده الى عنقه اطلقه عدله او اوبقه جوره

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি দশজনেরও শাসক, সেও কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় আসবে যে, তার হাত ঘাড়ের সাথে বাঁধা থাকবে। তার ন্যায়পরায়ণতা তাকে মুক্ত করবে অথবা তার যুলুম তাকে ধ্বংস করবে।'

খলীফা হযরত উমর (রাঃ) মা'কাল ইবনে ইয়াসারকে কোন প্রদেশের শাসক নিযুক্ত করতে চাইলে তিনি আরয করলেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, এ ব্যাপারে আপনিই আমাকে পরামর্শ দিন আমার এ পদ কবুল করা উচিত কি না? খলীফা বললেন ঃ যদি আমার পরামর্শের উপরই নির্ভর কর, তবে আমার মতে কবুল না করাই ভাল। কিন্তু আমার এ পরামর্শের কথা অন্য কাউকে বলবে না।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ হে আবদুর রহমান! শাসক পদের জন্য আবেদন করো না। যদি আবেদন ছাড়াই পেয়ে যাও, তবে এর জন্যে তুমি অদৃশ্য জগত থেকে সাহায্য পাবে। আর আবেদন করে পেলে সাহায্য পাবে না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার রাফে' ইবনে উমরকে বললেন ঃ দু'ব্যক্তির উপরও শাসক হয়ো না। কিন্তু পরে যখন হযরত আবূ বকর নিজে খলীফা হলেন, তখন রাফে দাঁড়িয়ে তাঁর খেদমতে আরয করলেন ঃ আপনি কি আমাকে বলেননি যে, দু'ব্যক্তির উপরও শাসক হয়ো না? এখন তো আপনাকে সমগ্র উম্মতের শাসনভার অর্পণ করা হয়েছে। হযরত আবূ বকর বললেন ঃ আমি এখনও সেকথাই বলি। যে ব্যক্তি শাসক হয়ে ন্যায়বিচার করে না, তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

যে সকল হাদীসের মধ্যে শাসক হওয়ার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং

যে সকল হাদীসে শাসক হতে নিষেধ করা হয়েছে, কোন স্বল্পজ্ঞান ব্যক্তি সেগুলোকে হয়তো পরস্পরবিরোধী মনে করবে। অথচ এরূপ নয়। এ সম্পর্কে সত্য কথা এই যে, যারা শক্তিশালী ধার্মিক, তাদের শাসক হতে অস্বীকার করা উচিত নয়। আর যারা দুর্বল, তাদের অবশ্যই এর ধারে-কাছে না যাওয়া উচিত। গেলে নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যাবে। শক্তিশালী ধার্মিক তারাই, যারা আল্লাহর কাজে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না এবং দুনিয়া যেদিকেই যাক, তারা লোভ ও লালসার জালে আবদ্ধ হয় না। এ ধরনের ব্যক্তিদের প্রতিটি নড়াচড়া ও উঠাবসা ন্যায়ানুগ হয়ে থাকে। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্যে প্রাণনাশের আশংকা থাকলেও তারা পরওয়া করে না। সুতরাং শাসক হওয়া এরূপ ব্যক্তিদেরই কাজ। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জানে যে, এসব গুণ তার মধ্যে নেই, শাসক হওয়া তার জন্যে হারাম।

শক্তিশালী ও দুর্বলের উপরোক্ত পার্থক্য জানার পর এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হযরত আবূ বকরের রাফে'কে শাসক হতে নিষেধ করা এবং নিজের শাসক হয়ে যাওয়া পরস্পর বিরোধী নয়।

বিচারকের পদ শাসনকর্তার নিম্নে হলেও এর বিধানও শাসনকর্তার পদের অনুরূপ। এতেও শাসনক্ষমতা আছে, যা স্বভাবতই প্রিয়। বিচারকের পদে যদি ন্যায়ের অনুসরণ করা হয়, তবে অনেক সওয়াব, আর যদি ন্যায় থেকে বিচ্যুতি ঘটে, তবে আযাবও অনেক। হাদীসে বর্ণিত আছে, বিচারক তিন প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার জান্নাতে এবং দু'প্রকার জাহান্নামে যাবে। অন্য হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি নিজে বিচারক হওয়ার আবেদন করে, সে ছুরি ছাড়াই যবেহ হয়ে যায়। সারকথা, যারা দুর্বল ধার্মিক এবং যাদের দৃষ্টিতে জাগতিক সামগ্রীর কদর আছে, তারা বিচারকের পদ থেকে দূরে থাকবে। আর যারা শক্তিশালী, কেবল তারাই এ পদ গ্রহণ করবে। যদি শাসনকর্তা যালেম হয় এবং জানা থাকে যে, বিচারককে তার মরযী মেনে চলতে হবে, তবে কোনক্রমেই বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। যদি কেউ হয়ে যায়, তবে তার কর্তব্য হবে বিচারকার্যে শাসনকর্তাকে সর্বসাধারণের মত গণ্য করা। এক্ষেত্রে পদচ্যুতির অজুহাত মোটেই কল্যাণকর নয়।

ন্যায়ানুগ বিচারকার্যের কারণে যদি বিচারক পদচ্যুতও হয়ে যায়, তবে এজন্যে আনন্দিত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা বিপদ টলিয়ে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে যদি পদচ্যুতিকে অসহনীয় মনে করে শাসনকর্তার মরযী অনুযায়ী ন্যায়বিচার বিসর্জন দেয় এবং এতে কোন দোষ না দেখে, তবে এরূপ বিচারক খেয়াল-খুশীর অনুসারী ও শয়তানের চেলা বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় সওয়াবের আশা করা দূরের কথা, সে যালেমদের তালিকাভুক্ত হয়ে দোযখের নিম্নস্তরে স্থান পাবে।

ওয়ায, শিক্ষকতা ও ফতোয়াদানের অবস্থাও তদ্রূপ। অর্থাৎ, এগুলোর মাধ্যমেও প্রভাব-প্রতিপত্তি, যশ ও সম্মান বৃদ্ধি পায় বিধায় বিপদাশংকাও বেশী। পূর্ববর্তী মনীষীগণ যতটা সম্ভব ফতোয়াদান থেকে বিরত থাকতেন। ওয়ায়েয যখন ওয়ায দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত, ক্রন্দনরত ও তার প্রতি আকৃষ্ট দেখতে পায়, তখন তার মনে এমন অনাবিল আনন্দের ঢেউ খেলে যায়, যার সমান কোন আনন্দ নেই। তখন তার মনে চায়, এমন ওয়াযই করা উচিত, যা মানুষের কাছে ভাল লাগে যদিও তা ভ্রান্ত হয়। আর যে কথা সত্য হলেও মানুষের কাছে ভাল লাগে না, তা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এরপর মানুষের মনে সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ওয়ায়েয কেবল এমন ওয়ায করে, যাতে শ্রোতাদের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। সে কোথাও হাদীস ও জ্ঞানের কথা শুনলে এই ভেবে আনন্দিত হয় যে, এবারের ওয়াযে এটি বর্ণনা করব এবং শ্রোতাদের কাছ থেকে ধন্যবাদ কুড়াব। অথচ এই ভেবে আনন্দিত হওয়া সমীচীন ছিল যে, আমার সৌভাগ্য যে, হাদীসটি পেয়েছি। সুতরাং প্রথমে আমি আমল করব, অতঃপর অন্যদের কাছে পৌঁছাব, যাতে তারাও আমল করে উপকৃত হয়। খলীফা হযরত উমর (রাঃ) নিজে খোতবা দিতেন এবং ওয়ায করতেন। কিন্তু যখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর ওয়ায করার অনুমতি চাইল, তখন তাকে নিষেধ করলেন। এতে লোকটি বলল ঃ আপনি কি মানুষকে উপদেশ দিতে নিষেধ করেন? তিনি বললেন ঃ আমার আশংকা হয়, তুমি ভুলক্রমে আকাশে পৌঁছে যাবে। এরূপ বলার কারণ এই, তিনি লোকটির মধ্যে যশ ও মর্যাদার মোহ আঁচ করতে পেরেছিলেন।

এবাদতের আগে-পরে ও মাঝে মুরীদের কি করা উচিত ঃ প্রকাশ

থাকে যে, আপন এবাদত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার জানা নিয়েই মুরীদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলার জানা নিয়ে সে-ই সন্তুষ্ট থাকে, যে আল্লাহকেই ভয় করে এবং তাঁর কাছেই প্রতিদান আশা করে। যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহকে ভয় করে এবং তার কাছে আশা করে, সে তাকে নিজের এবাদত সম্পর্কে জানাতেও আগ্রহী হয়। সুতরাং কারও অবস্থা এরূপ হলে তার উচিত জ্ঞান ও ঈমানের কারণে মনে মনে এর নিন্দা করা। কেননা, এ কারণে আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির আশংকা আছে। যখন কেউ কোন কঠিন ও দুরূহ এবাদত করে, যা অপরের দ্বারা সচরাচর হয় না, তখন আপন নফসের হেফাযত করা জরুরী। কারণ, নফস এ ধরনের এবাদত অন্যের কাছে প্রকাশ করে দিতে পুরাপুরি আগ্রহী থাকে। নফস বলে ঃ তোমার এই বড় এবাদত ও মহান খোদাভীতি সম্পর্কে জনসাধারণ অবগত হলে তারা ভক্তির আতিশয্যে তোমাকে সেজদা করতে শুরু করবে। কারণ, তাদের মধ্যে কে আছে, যে এরূপ এবাদত করতে পারে? মোটকথা, কেউ এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তার কর্তব্য হবে দৃঢ়পদ থাকা এবং নিজের এবাদতের মোকাবিলায় পরকালের মাহাত্ম্য ও জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতকে স্মরণ করা। তার আরও চিন্তা করা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলার এবাদত দ্বারা বান্দার কাছ থেকে প্রশংসা কুড়ানোর মধ্যে খোদায়ী গযব ও ক্রোধ নিহিত রয়েছে। সুতরাং এবাদত প্রকাশ করা অন্যের কাছে ভাল মনে হলেও আল্লাহ তাআলার কাছে অবনতি ও আমল বিনষ্ট হওয়ার কারণ। তার এই মনে করে নিরাশ হওয়া উচিত নয় যে, এখলাস তথা আন্তরিকতা তো বড়দের কাজ। যারা মিশ্র আমল করে, তারা এই মর্তবা কোথায় পাবে! বরং তার জানা উচিত যে, যারা মুত্তাকী ও খোদাভীরু, তাদের তুলনায় যারা মুত্তাকী নয়, এখলাসের প্রয়োজনীয়তা তাদের বেশী। কেননা, মুত্তাকীদের যদি নফল এবাদত বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে ফরয এবাদত পূর্ণই থেকে যাবে। কিন্তু যারা মুত্তাকী নয়, তাদের তো ফরয এবাদতও ত্রুটিপূর্ণ। তাদের এই ত্রুটি নফল এবাদত দ্বারা পূর্ণ করা হবে। যদি নফল এবাদত সঠিক না হয়, তবে ফরয এবাদত ত্রুটিপূর্ণই থেকে যাবে। তামীম দারী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে,

কিয়ামতে হিসাব-নিকাশের সময় যদি ফরযে ত্রুটি দেখা যায়, তবে আদেশ হবে, দেখ, তার কোন নফল এবাদত আছে কি না। থাকলে তা দ্বারা ফরযের ত্রুটি পূরণ করা হবে। অন্যথায় তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। অতএব, কিয়ামতে মিশ্র আমলকারীর ফরয এবাদত ত্রুটিযুক্ত হবে এবং গোনাহ প্রচুর হবে। ফরযের ত্রুটি দূর করা এবং গোনাহের কাফফারা নফল এবাদতে এখলাস ছাড়া সম্ভবপর নয়। এ থেকে জানা গেল যে, এবাদত করার সময় এবং এবাদত সমাপ্ত করার পরও অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় থাকা উচিত, যাতে এবাদতকে মানুষের কাছে প্রকাশ না করে। এজন্যে এবাদত কবুল হওয়া-না হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান থাকা জরুরী। এই সন্দেহ ও ভয় এবাদতের সময় ও এবাদতের পর করা উচিত—নিয়তের শুরুতে নয়। বরং শুরুতে নিজের এখলাস সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী হবে, যাতে এবাদত সঠিক হয়। শুরু করার পর যখন এতটুকু সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, যাতে অনবধান ও ভুল হতে পারে, তখন আশংকা করা সমীচীন যে, এই অনবধানতার মধ্যে সম্ভবত কোন রিয়া অথবা আত্মপ্রীতি এসে গেছে, যাতে এবাদত বাতিল হয়ে যেতে পারে। তবে এবাদত কবুল হওয়ার আশা প্রবল থাকা উচিত। কেননা, এবাদতের মধ্যে এখলাস নিশ্চিতরূপেই রয়েছে। তবে রিয়ার কারণে তা বাতিল হয়েছে কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ। সুতরাং নিশ্চিত বিষয়ের আশা প্রবল থাকা দরকার। এ বিষয়টি জানার কারণে মোনাজাত ও এবাদতে খুব আনন্দ পাওয়া যায়। কেননা, এখলাস তো নিশ্চিত এবং রিয়ার মধ্যে সন্দেহ। যে ব্যক্তি এই সন্দেহকেও ভয় করে, তার ভয় তাকে সংশোধনে উৎসাহিত করে।

যে ব্যক্তি পরোপকার ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করে, তারও নিজের জন্যে সওয়াবের আশা করা উচিত। কেননা, যার উপকার করা হবে, তার মন তুষ্ট হবে এবং যাকে শিক্ষাদান করা হবে, সে শিক্ষা অনুযায়ী আমল করবে। এগুলো সওয়াবেরই বিষয়। কিন্তু শুধু সওয়াবেরই আশা করা উচিত—কৃতজ্ঞতা, প্রতিদান ও প্রশংসা কীর্তনের আশা করা উচিত নয়—যাকে শিক্ষাদান করা হয়, তার কাছ থেকেও নয়

এবং যার উপকার হয়, তার কাছ থেকেও নয়। অন্যথায় আমল বরবাদ হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ যদি শিক্ষার্থীদের কাছে আশা করা হয় যে, শিক্ষাদানের বিনিময়ে সে আমার কাজকর্ম ও খেদমত করবে অথবা দল ভারী হওয়ার জন্যে পথে আমার সঙ্গে চলবে, তবে বুঝতে হবে যে, সে তার মজুরী আদায় করে নিয়েছে। এ ছাড়া সে কোন সওয়াব পাবে না। কিন্তু শিক্ষক যদি কোন আশা না করে এবং শিক্ষার্থী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে খেদমত করে, তবে আশা করা যায়, শিক্ষকের সওয়াব বাতিল হবে না। কিন্তু পূর্ববর্তী আলেমগণ এ ধরনের খেদমত এরূপ করতেও আপত্তি করতেন। বর্ণিত আছে, জনৈক আলেম কূপে পড়ে যান। তাকে কূপ থেকে উপরে তোলার জন্যে লোকজন দৌড়ে এল এবং কূপের ভেতরে রশি ফেলল। কিন্তু তিনি কূপের মধ্য থেকে কসম দিলেন যে, যে ব্যক্তি তার কাছে কোরআন পাকের একটি আয়াতও পাঠ করেছে অথবা একটি হাদীসও শুনেছে, সে যেন এই রশি স্পর্শ না করে। তিনি আশংকা করছিলেন যে, এতটুকু খেদমত গ্রহণ করার কারণেও আমল বাতিল হয়ে যেতে পারে।

হযরত শাকীক বলখী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি একটি বস্ত্র হযরত সুফিয়ান ছওরীর কাছে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করলে তিনি তা গ্রহণ না করে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ঃ হুযুর, আমি তো আপনার কাছে হাদীস পড়িনি। আপনি উপহারটি ফেরত পাঠালেন কেন? হযরত সুফিয়ান বললেন ঃ তুমি পড় না ঠিক; কিন্তু তোমার ভাই তো পড়ে। আমি আশংকা করি যে, এই উপহারের কারণে তার প্রতি আমার অন্তর অন্যের তুলনায় অধিক না ঝুঁকে পড়ে।

একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত সুফিয়ানের খেদমতে একটি মুদ্রার থলে নিয়ে আগমন করল। লোকটির পিতা তাঁর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তিনি প্রায়ই তার কাছে চলে যেতেন। লোকটি আরয করল ঃ আমার পিতা সম্পর্কে আপনার অন্তরে কোন খটকা আছে কি? তিনি বললেন ঃ না। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। সে তো অত্যন্ত সাধু ব্যক্তি ছিল। লোকটি আরয করল ঃ আপনি জানেন যে, এই থলেটি তারই ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে

আমার অধিকারে এসেছে। অতএব আপনিও এর দ্বারা আপনার পরিবারের কিছুটা ভরণ-পোষণ করুন। একথা শুনে হযরত সুফিয়ান থলেটি গ্রহণ করলেন। কিন্তু লোকটি চলে যাওয়ার পর তিনি নিজের পুত্র মোবারককে বললেন ঃ শীঘ্র যাও এবং লোকটিকে আমার কাছে ডেকে আন। লোকটি পুনরায় আগমন করলে তিনি বললেন ঃ এখন আমার ইচ্ছা, তুমি তোমার থলেটি নিয়ে যাও। অতঃপর লোকটি খুব পীড়াপীড়ি করল। কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না। সম্ভবত এর কারণ এই ছিল যে, লোকটির পিতার সাথে তাঁর আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত ছিল। কাজেই তার সম্পত্তি থেকে কিছু নেয়া পছন্দ করেননি। তাঁর পুত্র মোবারক বলেন ঃ লোকটি তার অর্থ নিয়ে চলে গেলে আমি থাকতে পারলাম না এবং পিতার খেদমতে এসে আরয করলাম ঃ আপনার কি হল? এই সামান্য মুদ্রা আপনি ফিরিয়ে দিলেন কেন? আমাদের এখানে পরিবার-পরিজন রয়েছে। আপনার ভ্রাতারা আছেন। আপনার কি আমাদের প্রতি দয়া হয় না? তিনি বললেন ঃ মোবারক, আল্লাহকে ভয় কর। মজা করে খাবে তোমরা, আর এর জওয়াবদিহি করব আমি, এটা হতে পারে না। এ থেকে জানা গেল, আলেমের কাছ থেকে কেউ কোন ফয়েয পেলে আলেম তার সওয়াব কেবল আল্লাহ তা'আলার কাছেই আশা করবে। শিষ্যও সর্বদা আল্লাহর কাছেই সওয়াব ও মর্যাদা অন্বেষণ করবে। মাঝে মাঝে শিষ্য মনে করে যে, প্রকাশ্যে আল্লাহর এবাদত করলে ওস্তাদের অন্তরে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং লেখাপড়া ভাল হবে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। কেননা, অন্যকে তুষ্ট করার নিয়তে আল্লাহর এবাদত করার ক্ষতি নগদ এবং লেখাপড়ার উপকার হওয়া-না হওয়া সন্দিগ্ধ ব্যাপার। সুতরাং নগদ আমলকে সন্দিগ্ধ উপকারের বিনিময়ে নষ্ট করা বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। বরং শিষ্যের উচিত আল্লাহর জন্যেই লেখাপড়া করা, তাঁরই জন্যে এবাদত করা এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে ওস্তাদের খেদমত করা। এরূপ হলে লেখাপড়াও এবাদত বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে পিতামাতার সেবাও এই মনে করে করবে যে, পিতামাতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। এই মনে করে নয় যে, সেবা করলে তাদের অন্তরে আমার আসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অহংকার ও আত্মপ্রীতি

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِى وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِى الحديث

অর্থাৎ, 'অহংকার আমার চাদর এবং মহত্ত্ব আমার পরিধেয়। যে ব্যক্তি এ দুটি বিষয়ে আমার সাথে বিরোধ করে, আমি তাকে চুরমার করে দেব।'

অন্য এক হাদীসে আছে—

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ

অর্থাৎ, 'তিনটি বিষয় বিনাশকারী। এক, কৃপণতা, মানুষ যার অনুগত হয়। দুই, মানসিক প্রবৃত্তি, মানুষ যার অনুগামী হয়। তিন, আত্মপ্রীতি।'

অতএব, অহংকার ও আত্মপ্রীতি মারাত্মক ব্যাধি। অহংকারী ও আত্মপ্রিয় ব্যক্তি রুগ্ন এবং আল্লাহর দুশমন। এ খণ্ডে বিনাশকারী বিষয়সমূহ বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য বিধায় অহংকার ও আত্মপ্রীতি সম্পর্কে আলোচনা করা নেহায়েত জরুরী। নিম্নে দুটি বিষয়কে পৃথক পৃথক বর্ণনা করা হচ্ছে।

অহংকারের নিন্দা ঃ কোরআন পাকে বহু স্থানে আল্লাহ তা'আলা অহংকার ও অহংকারীদের নিন্দা বর্ণনা করেছেন। উদাহরণতঃ এরশাদ হয়েছে ঃ

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيَاتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

অর্থাৎ, 'যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দাম্ভিকতা করে, আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী থেকে হটিয়ে দিব।' (সূরা আ'রাফ ঃ ১৪৫)

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

অর্থাৎ, 'এমনিভাবে আল্লাহ মোহর এঁটে দেন প্রত্যেক দাম্ভিক অবাধ্যের অন্তরে।'

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ

অর্থাৎ, তারা ফয়সালা চাইতে লাগল এবং ব্যর্থ হল প্রত্যেক অবাধ্য হটকারী।

لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِيْنَ

অর্থাৎ, আল্লাহ অহংকারীদেরকে ভালবাসেন না।

لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا

অর্থাৎ, তারা মনে মনে খুব অহংকার করে এবং মারাত্মক সীমালঙ্ঘন করে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা আমার এবাদতে অহংকার করে, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

মোটকথা, অহংকারের নিন্দা কোরআন মজীদে বহু জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبْرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ اِيْمَانٍ

অর্থাৎ,' যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে না এবং যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে দোযখে প্রবেশ করবে না।'

আবূ সালমা ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেন—একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর মারওয়ায় একত্রিত হলেন। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর প্রথমোক্ত জন চলে গেলেন এবং শেষোক্ত জন দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর আমাকে একটি হাদীস শুনিয়ে গেলেন যে, রসূলে করীম (সাঃ)-কে তিনি বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তির অন্তরে একটি সরিষাদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—মানুষ নিজেকে এত উঁচুতে নিয়ে যায় যে, পরিণামে সে অহংকারীদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়। ফলে যে শাস্তি অহংকারীরা পায়, তা সে-ও পায়।

হযরত সোলায়মান (আঃ) একদিন মানুষ, জিন ও পশুপক্ষীদেরকে ময়দানে সমবেত হতে আদেশ করলেন। সেমতে দু'লাখ মানুষ, জিন ইত্যাদি সমবেত হল। অতঃপর হযরত সোলায়মান (আঃ) এত উঁচুতে উঠলেন যে, ফেরেশতাদের তাসবীহ তাঁর শ্রুতিগোচর হল। এরপর তাঁকে নিম্নে নামানো হল, এমনকি তাঁর পদযুগল সমুদ্র স্পর্শ করল। সেখানে তিনি এই আওয়াজ শুনতে পেলেন— যদি তোমাদের প্রভু অর্থাৎ সোলায়মানের অন্তরে কণা পরিমাণও অহংকার থাকে, তবে তাকে যতটুকু উপরে উঠানো হয়েছে, তার চেয়েও বেশী পাতালে নামিয়ে দেব।

বর্ণিত আছে, জান্নাত ও দোযখের মধ্যে কথোপকথন হল। দোযখ বলল ঃ আমি অহংকারী ও শক্তিধরদেরকে পাব। জান্নাত বলল ঃ তা হলে আমি কি অপরাধ করলাম যে, দুর্বল ও অক্ষমরাই আমার মধ্যে স্থান পাবে? আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বললেন ঃ তুমি আমার রহমত। আমি যাকে ইচ্ছা তোমার মাধ্যমে রহমত দেব। অতঃপর দোযখকে বললেন ঃ তুই আমার আযাব। আমি যাকে ইচ্ছা, তোর মাধ্যমে আযাব দেব এবং জান্নাত ও দোযখ উভয়কে পরিপূর্ণ করে দেব। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—দুষ্ট বান্দা সে-ই, যে জবরদস্তি ও সীমালঙ্ঘন করে এবং সর্বশক্তিমানকে ভুলে যায়। দুষ্ট বান্দা সেই, যে যুলুম করে ও অহংকার করে এবং মহান আল্লাহর প্রতি মনোযোগ দেয় না। মন্দ বান্দা সেই, যে ভ্রান্তি ও ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত থাকে এবং কবরে মাটি হয়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করে না। অধম বান্দা

সেই, যে অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং সূচনা ও পরিণতির কথা একবারও ভেবে দেখে না। হযরত ছাবেত (রাঃ) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল—অমুক ব্যক্তি সাংঘাতিক অহংকারী। তিনি বললেন ঃ তার কি মৃত্যু নেই?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, হযরত নূহ (আঃ)-এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি আপন পুত্রদ্বয়কে ডেকে বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে দুটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি এবং দুটি বিষয়ের আদেশ করছি। শিরক ও অহংকার থেকে নিষেধ করছি এবং কালেমায়ে তাইয়েবার আদেশ করছি। কেননা, আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং কালেমায়ে তাইয়েবা অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তবে কালেমায়ে তাইয়েবার পাল্লাই ভারী হবে। দ্বিতীয় যে বিষয়ের আদেশ করছি, তা হচ্ছে "সোবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী"। কেননা, এরই মাধ্যমে প্রত্যেক বস্তুকে রিযিক দেয়া হয়।

হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন, মোবারক সেই বান্দা, যাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাব শিক্ষা দেন এবং সে নিরহংকার হয়ে দুনিয়া ত্যাগ করে। অন্য এক হাদীসে আছে—কিয়ামতের দিন অহংকারীরা পিপীলিকার আকৃতিতে পুনরুত্থিত হবে। মানুষ তাদেরকে পদতলে পিষ্ট করে চলবে। সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা তাদেরকে ঘিরে রাখবে। দোযখীদের পুঁজ ও কাদা তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে। হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রতাপশালী ও অহংকারী লোক কিয়ামতে পিঁপড়ার আকারে উত্থিত হবে। মানুষ তাদেরকে পায়ের নিচে পিষ্ট করবে। কেননা, তারা দুনিয়াতে আল্লাহকে হেয় মনে করেছিল।

মোহাম্মদ ইবনে ওয়াসে বলেন ঃ আমি বেলাল ইবনে আবী বুরদার কাছে গিয়ে বললাম, তোমার পিতা আমার কাছে তার পিতার বাচনিক রসূলে করীম (সাঃ)-এর এই হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন— দোযখে "মুহিব" নামক একটি জঙ্গল আছে। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা অহংকারীরা তাতে বাস করুক। সুতরাং হে বেলাল, তুমি নিজেকে অহংকারমুক্ত রাখ। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে— যে ব্যক্তি তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে

মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে– এক, অহংকার, দুই, ফরয এবং তিন, খিয়ানত তথা বিশ্বাস ভঙ্গকরণ।

অহংকারের নিন্দায় অনেক মনীষীর উক্তিও বর্ণিত আছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ এক মুসলমান যেন অন্য মুসলমানকে হেয় জ্ঞান না করে। কেননা, মুসলমানদের মধ্যে যে ক্ষুদ্র, সে আল্লাহর কাছে বড়। ওয়াহাব (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা "জান্নাতে আদম"-কে সৃষ্টি করার পর তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ অহংকারী ব্যক্তির জন্যে তুমি হারাম। হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ আশ্চর্যের বিষয়, মানুষ প্রত্যহ একবার অথবা দু'বার আপন হাতে পায়খানা ধৌত করে, এরপরও অহংকার করে এবং আকাশ ও পৃথিবীতে যিনি প্রতাপশালী তাঁর মোকাবিলা করে। হযরত মোহাম্মদ ইবনে হুসায়ন ইবনে আলী (রাঃ) বলেন ঃ মানুষের অন্তরে যে পরিমাণে অহংকার আসে, সেই পরিমাণের জ্ঞানবুদ্ধি হ্রাস পায়। অহংকার কম হলে বুদ্ধির ক্ষতিও কম হবে এবং বেশী হলে বেশী। হযরত সালমান (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ সেই কুকর্ম কোন্‌টি যার উপস্থিতিতে সৎকর্ম উপকারী হয় না? তিনি বললেন ঃ অহংকার। হযরত নোমান ইবনে বশীর (রহঃ) বলেন ঃ শয়তানের অনেক ফাঁদ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহর নেয়ামত পেয়ে অহংকার করা এবং খেয়ালখুশির অনুসরণ করা। আল্লাহ আমাদেরকে এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে রক্ষা করুন।

কাপড় ঝুলিয়ে অথবা সদর্পে চলা ঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

لَايَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلٍ يَجُرُّ اِزَارَهٗ بَطَرًا

অর্থাৎ, 'আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, যে লুঙ্গি হেঁচড়িয়ে সদর্পে চলে।'

যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন— আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর খেদমতে গেলাম। তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকেদ নতুন পোশাক পরিধান করে তার কাছ দিয়ে চলে গেলেন। তিনি বললেন ঃ বৎস! লুঙ্গি আরও উঁচুতে পরিধান কর। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে কেউ সদর্পে লুঙ্গি টেনে চলবে কিয়ামতের

দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। বর্ণিত আছে, একদিন রসূলে আকরাম (সাঃ) নিজের হাতের তালুতে থুথু নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর তাতে অঙ্গুলি রেখে বললেন ঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার কবল থেকে বেঁচে যাবে? আমি তোমাকে এরই মত বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর যখন তোমাকে সবল ও বলিষ্ঠ করেছি, তখন পোশাক পরে এমন সদর্পে চল যে, পৃথিবী পর্যন্ত আর্তনাদ করে। তুমি ধন সঞ্চয় কর এবং কাউকে কিছু দাও না। যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তখন বলতে শুরু কর, আমি দান-খয়রাত করব। সেটা কি দান-খয়রাতের সময়? এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন আমার উম্মত অহংকার করে চলতে শুরু করবে এবং পারস্য ও রোমবাসীরা তাদের খেদমত করতে থাকবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এককে অপরের উপর চাপিয়ে দেবেন। এক হাদীসে আরও এরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি আপন মনে মনে বড় সাজে এবং দর্প ভরে চলে, সে যখন আল্লাহর কাছে যাবে, তখন আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন।

আবূ বকর হুযালী বর্ণনা করেন, একবার আমরা কয়েকজন হযরত হাসান বসরীর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় শাসক ইবনে আহতাম সেখান দিয়ে পায়খানায় যাচ্ছিল। সে কয়েকটি রেশমী কোর্তা পরিধান করেছিল, যা পায়ের গোছার উপর ভাঁজে ভাঁজে রাখা ছিল। তার চলনভঙ্গিতে দর্প ও অহংকার পরিস্ফুট ছিল। হযরত হাসান বসরী একবার তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ এই নাক বাড়ানো, কোমর বাঁকানো এবং গ্রীবা ঘুরানোর জন্যে আফসোস। হে নির্বোধ! তুমি ডানে-বামে ঘুরে ঘুরে কি দেখছ? তোমার ডানে-বামে আল্লাহর নেয়ামতরাজি রয়েছে, সেগুলোর তুমি শোকর আদায় করনি। ইবনে আহতাম একথা শুনে ফিরে এল এবং তার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না। আল্লাহর সামনে তওবা কর। তুমি কি আল্লাহ পাকের এই উক্তি পাঠ করনি—

وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا-

অর্থাৎ, 'গর্বভরে পদচারণা করো না। কেননা, তুমি যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং লম্বা হয়ে পর্বতশিখরে পৌঁছতে সক্ষম হবে না।'

একবার জনৈক উৎকৃষ্ট পোশাক পরিহিত যুবক হযরত হাসানের সম্মুখ দিয়ে গমন করলে তিনি তাকে ডেকে বললেন ঃ মানুষ তার যৌবন ও সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করে। মনে করা উচিত যে, কবর দেহকে আবৃত করেছে এবং কৃতকর্ম সামনে এসেছে। যাও, অন্তরের চিকিৎসা কর। বান্দার অন্তর সংশোধিত হোক—এটাই আল্লাহ তা'আলার কাম্য।

বর্ণিত আছে, একবার খলীফা মনোনীত হওয়ার পূর্বে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) হজ্জ করেন। হযরত লাউস (রহঃ) তাঁর চালচলনে কিছুটা অহংকার লক্ষ্য করলেন। তিনি তার পেটের এক পার্শ্বে অঙ্গুলি দিয়ে খোঁচা মেরে বললেন ঃ যার পেট বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ, তার চালচলন এমন হয় না। হযরত উমর ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বললেন ঃ চাচা, এ চালচলন শিক্ষা দেয়ার জন্যে আমার বড়রা আমার প্রতিটি অঙ্গে প্রহার করেছে। মোহাম্মদ ইবনে ওয়াসে আপন পুত্রকে অহংকার করতে দেখে কাছে ডেকে বললেন ঃ তুমি কে জান? তোমার মাকে আমি দু'শ' দেরহাম দিয়ে ক্রয় করেছিলাম। আর তোমার পিতা এমন যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের মধ্যে এরূপ লোক বেশী সৃষ্টি না করলেই ভাল হয়।

বর্ণিত আছে, মুতারিক ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) মুহাল্লাবকে রেশমী জুব্বা পরিধান করে গর্ব করতে দেখে বললেন ঃ হে আল্লাহর বান্দা, তোমার এই চলনকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল পছন্দ করেন না। মুহাল্লাব বলল ঃ আপনি জানেন, আমি কে? মুতারিক বললেন ঃ হাঁ, জানি। প্রথমে তুমি নাপাক বীর্য ছিলে এবং পরিণামে নাপাক মাটি হয়ে যাবে। বর্তমানে ময়লা বহন করে ফিরছ। মুহাল্লাব একথা শুনে চলে গেল এবং গর্ব পরিত্যাগ করল।

আমরা যেখানে অহংকার ও গর্বের নিন্দা লিপিবদ্ধ করেছি, সেখানে কিছুটা বিনয়ের ফযীলত লেখাও সমীচীন মনে হয়।

বিনয় ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন—

مَازَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ

অর্থাৎ, 'ক্ষমার কারণে আল্লাহ তা'আলা কেবল বান্দার ইযযতই বৃদ্ধি করেন এবং আল্লাহর জন্যে যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উঁচুতে তুলে দেন।'

এক হাদীসে আছে, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে দু'জন ফেরেশতা রয়েছে। তারা বলগার সাহায্যে তাকে নিমন্ত্রণ করে। যদি সে ব্যক্তি নিজেকে উঁচু করে, তবে ফেরেশতারা বলগা টেনে ধরে এবং বলে ইলাহী, তুমি এই ব্যক্তিকে নিচু করে দাও। আর যদি বিনয় ও আনুগত্য করে, তবে ফেরেশতারা দোয়া দেয় এবং বলে, ইলাহী, একে উঁচু কর। আরও বলা হয়েছে—সে ব্যক্তি সুখী, যে দরিদ্র না হয়েও বিনয় করে, সৎপথে উপার্জিত ধন ব্যয় করে, অবহেলিত ও দরিদ্রদের প্রতি দয়া করে এবং জ্ঞানীদের সাথে সাক্ষাৎ করে।

আবূ সালমা মুদায়নী তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযা রেখে মসজিদে কুবায় অবস্থান করছিলেন। ইফতারের সময় আমরা এক পিয়ালা দুধের সাথে সামান্য মধু মিশ্রিত করে পেশ করলাম। তিনি তা মুখে দিয়ে যখন মধুর স্বাদ আস্বাদন করলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি? আমরা বললাম ঃ দুধের সাথে সামান্য মধু মিশ্রিত করেছি। তিনি পিয়ালা রেখে দিলেন এবং বললেন ঃ আমি একে হারাম করি না। এরপর তিনি নিম্নোক্ত বাক্যাবলী উচ্চারণ করলেন—

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ وَمَنْ
اِقْتَصَرَ اَغْنَاهُ وَمَنْ بَذَّرَ اَفْقَرَهُ اللّٰهُ وَمَنْ ذَكَرَ اللّٰهَ اَحَبَّهُ اللّٰهُ-

অর্থাৎ, 'যে আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় করে, আল্লাহ তাকে উঁচু করেন। যে অহংকার করে আল্লাহ তাকে নিচে নামিয়ে দেন। যে মধ্যপথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে ধনী করেন। যে অপব্যয় করে, আল্লাহ তাকে ফকীর করেন, আর যে আল্লাহর যিকির করে আল্লাহ তাকে বন্ধু করে নেন।'

এক হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার পালনকর্তা আমাকে দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি বেছে নেয়ার ক্ষমতা দিলেন—হয় আমি দাস ও রসূল হব, না হয় বাদশাহ ও নবী হব। কিন্তু কোন্‌টি বেছে নিব, তা আমার জানা ছিল না। ফেরেশতাদের মধ্যে আমার বন্ধু জিবরাঈল উপস্থিত ছিলেন। আমি তার দিকে মাথা তুলে তাকালে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সামনে বিনয় করুন। সেমতে আমি আরয করলাম ঃ আমি দাস ও রসূল হতে চাই। হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা এই মর্মে ওহী করেন যে, আমি এমন ব্যক্তির নামায কবুল করি, যে আমার মাহাত্ম্যের সামনে বিনয়ী হয়, আমার বান্দাদের সাথে অহংকার করে না, অন্তরে আমার ভয় রাখে, অষ্টপ্রহর আমাকে স্মরণ করে এবং আমার খাতিরে নিজেকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখে। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَلْكَرَمُ التَّقْوٰى وَالشَّرَفُ التَّوَاضُعُ وَالْيَقِيْنُ الْغِنٰى

অর্থাৎ, 'মহত্ত্ব হচ্ছে খোদাভীতি, গৌরব হচ্ছে বিনয় এবং বিশ্বাস হচ্ছে ধনাঢ্যতা। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, সুসংবাদ তাদের জন্যে, যারা দুনিয়াতে বিনয়ী হয়। তারা কিয়ামতে মিম্বরের উপর উপবেশন করবে। সুসংবাদ তাদের জন্যে, যারা দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে। কিয়ামতে তারা জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিকারী হবে। সুসংবাদ তাদের জন্যে, যারা দুনিয়াতে আপন অন্তরকে পাক রাখে। কিয়ামতে তাদের আল্লাহর দীদার নসীব হবে। অন্য এক হাদীসে আছে—চারটি বিষয় এমন রয়েছে, যা কেবল সে ব্যক্তি পায়, যাকে আল্লাহ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে নেন—(১) চুপ থাকা, যা এবাদতের সূচনা, (২) আল্লাহর উপর ভরসা করা, (৩) বিনয় এবং (৪) সংসারবিমুখতা।

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত উচ্চতা দান করেন। রসূলে করীম (সাঃ) একদিন সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ ব্যাপার কি, আমি তোমাদের মধ্যে এবাদতের মিষ্টতা পাই না কেন? তারা আরয করলেনঃ এবাদতের মিষ্টতা কি? তিনি বললেন ঃ বিনয়।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ যখন বান্দা আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ তার জ্ঞান-গরিমা বাড়িয়ে দেন। আর যখন অহংকার ও যুলুম করে, তখন তাকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেন এবং আদেশ করেন—দূর হ! আল্লাহ তোকে দূর করেছেন। এরূপ ব্যক্তি স্বজ্ঞানে বড় হলেও মানুষের দৃষ্টিতে ছোট।

হযরত ফুযায়ল (রহঃ)-কে কেউ বিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ বিনয় হচ্ছে সত্যের সামনে বিনম্র ও অনুগত হওয়া যদিও সেই সত্য কোন বালক অথবা মূর্খের মুখ দিয়ে প্রকাশ পায়। ইবনে মোবারক বলেন ঃ বিনয় হচ্ছে নিজেকে সে ব্যক্তির চেয়ে কম মনে করা, যে পার্থিব নেয়ামতে তোমার চেয়ে কম এবং নিজেকে সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক মনে করা, যে পার্থিব নেয়ামতে তোমার চেয়ে বেশী। কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ধন, রূপ অথবা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে তাতে বিনয় করে না, কিয়ামতে এসব বিষয় তার জন্য শাস্তির কারণ হয়ে যাবে। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে দুনিয়াতে যে নেয়ামত দান করেন, সে যদি তার শোকর করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রদর্শন করে, তবে আল্লাহ তা'আলা সেই নেয়ামতের উপকার তাকে দুনিয়াতেও দান করেন এবং আখেরাতেও তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। পক্ষান্তরে যদি বান্দা সেই নেয়ামতের শোকর এবং বিনয় প্রদর্শন না করে, তবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও তার উপকার মওকুফ রাখেন এবং আখেরাতে তার জন্যে জাহান্নামের স্তর খুলে দেন।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর রীতি ছিল যে, তিনি সকালে বড়লোক, ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দিকে মনোযোগ দিতেন, এরপর ফকীর ও মিসকীনদের মধ্যে আসতেন এবং তাদের কাছে এই বলে বসে যেতেন যে, মিসকীন মিসকীনদের মধ্যেই এসেছে।

বর্ণিত আছে, একবার ইউসুফ, আইয়ুব ও হাসান (রহঃ) পথে বের হলেন। চলতে চলতে বিনয় সম্পর্কে আলোচনা শুরু হল। হযরত হাসান জিজ্ঞেস করলেন ঃ বিনয় কি জান? বিনয় হল গৃহ থেকে বের হওয়ার পর পথিমধ্যে যে মুসলমানের সাথে দেখা হয়, তাকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করা। হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ যখন নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় মহাপ্লাবনে

নিমজ্জিত হল, তখন প্রত্যেক পাহাড় একে অপরের সাথে পাল্লা দিয়ে উঁচু হতে লাগল। কিন্তু জুদী পাহাড় বিনয় অবলম্বন করল। আল্লাহ তা'আলা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করলেন এবং নূহ (আঃ)-এর নৌকা তার উপর অবস্থান নিল। যিয়াদ নুমায়রী বলেন ঃ যে দরবেশের মধ্যে বিনয় নেই, সে ফলহীন বৃক্ষসদৃশ। হযরত আবূ ইয়াযীদ বুস্তামী (রহঃ) বলেন ঃ ব্যক্তি যতক্ষণ মনে করে যে, মানুষের মধ্যে তার চেয়েও নিকৃষ্ট কেউ আছে, ততক্ষণ সে অহংকারী। লোকেরা প্রশ্ন করল ঃ তা হলে বিনয়ী কখন হবে? তিনি বললেন ঃ যখন নিজের জন্যে কোন স্থান ও মর্যাদা চিন্তা না করে। মানুষ যে পরিমাণে আল্লাহকে ও নিজেকে চিনে, সে পরিমাণে বিনয়ী হয়। ইয়াহইয়া ইবনে খালেদ বারমাকী (রহঃ) বলেন ঃ ভদ্রলোক এবাদতকারী হলে বিনয়ী হয় এবং নির্বোধ ও অভদ্র ব্যক্তি এবাদতকারী হলে নিজেকে বুযুর্গ মনে করতে থাকে। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেনঃ যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের কারণে তোমার সাথে অহংকার করে, তার সাথে তোমার অহংকার করাই বিনয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে বিনয় দান করুন।

অহংকারের স্বরূপ ও তার লাভ-লোকসান ঃ অহংকার দু'প্রকার। একটি বাহ্যিক, অপরটি অভ্যন্তরীণ। অভ্যন্তরীণ অহংকার হচ্ছে মনের অভ্যাস এবং বাহ্যিক অহংকার হচ্ছে ক্রিয়াকর্ম, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। বাস্তবে অভ্যন্তরীণ অভ্যাসকেই অহংকার বলা সঙ্গত। ক্রিয়াকর্ম এই অভ্যাসেরই ফলাফল। অভ্যাসই ক্রিয়াকর্মের কারণ হয়ে থাকে। অঙ্গের উপর যখন অভ্যাসের প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠে, তখন 'অহংকার করেছে' বলা হয়। মোটকথা, মানসিক চরিত্রসমূহের মধ্যে একটি চরিত্রকে বলা হয় অহংকার। তা হচ্ছে নিজেকে অন্যের উপর সেরা দেখে আনন্দ পাওয়া এবং তাতেই আকৃষ্ট হওয়া।

বলা বাহুল্য, অহংকার একটি আপেক্ষিক বিষয়। এতে একাধিক বিষয়ের উপস্থিতি দরকার—(১) অহংকারী, (২) যার সাথে অহংকার করা হয়, (৩) যে বিষয় নিয়ে অহংকার করা হয়। অহংকার ও আত্মপ্রীতির মধ্যে তফাৎ এখানেই। আত্মপ্রীতিতে কেবল কর্তার উপস্থিতিই যথেষ্ট। মানুষ যদি একাই সৃজিত হয় এবং তার সাথে অন্য কোন কিছু না থাকে, তবে সে

আত্মপ্রীতিতে লিপ্ত হতে পারবে—অহংকার করতে পারবে না। এ থেকে বুঝা গেল, অহংকারে কেবল নিজেকে বড় মনে করা যথেষ্ট নয়। কেননা, মাঝে মাঝে মানুষ নিজেকে বড় মনে করে। কিন্তু অপরকে নিজের চেয়েও বড় অথবা সমান জ্ঞান করে। এতে অহংকার হয় না। অনুরূপভাবে অপরকে হেয় মনে করাও অহংকারের জন্যে যথেষ্ট নয়। কেননা, মাঝে মাঝে মানুষ অপরকে হেয় মনে করে; কিন্তু নিজেকে তার চেয়েও অধিক হেয় মনে করে। এমতাবস্থায় সে অহংকারী হয় না। অপরকে নিজের অনুরূপ মনে করলেও অহংকার হয় না। অহংকারের জরুরী বিষয় হচ্ছে নিজের একটি মর্যাদা জানা এবং অপরের একটি মর্যাদা জানা। অতঃপর নিজের মর্যাদাকে অপরের মর্যাদার চেয়ে সেরা মনে করা। বিশ্বাসের মধ্যে এ তিনটি বিষয় একত্রিত হলে অহংকার হবে। কেবল নিজের মর্যাদা জানার নাম অহংকার নয়; বরং এই জানার কারণে ও বিশ্বাসের ফলে মনের মধ্যে একটি ফুৎকার পড়ে এবং মান-সম্মান ও আনন্দের দিকে গতিশীল হয়। সম্মান ও আনন্দের দিকে এই গতিশীলতাকেই অহংকার বলা হয়। হাদীস শরীফেও উপরোক্ত ফুৎকার উল্লিখিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اَعُوْذُبِكَ مِنْ نَفْخَةِ الْكِبْرِيَاءِ

অর্থাৎ, '(হে আল্লাহ!) আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অহংকারের ফুৎকার থেকে।'

জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ফজরের নামাযের পর ওয়ায করার অনুমতি চাইলে তিনি এমনিভাবে তাকে বলেছিলেন ঃ আমার আশংকা হয় যে, তুমি ফুলে-ফেঁপে সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষ যখন অহংকার করে, তখন ফুলে উঠে। এই ফুলে উঠাকে মাহাত্ম্যবোধও বলা হয়। সেমতে হযরত ইবনে আব্বাস নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তাই বলেছেন—

اِنْ فِىْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّاكِبْرٌ مَاهُمْ بِبَالِغِيْهِ

অর্থাৎ, 'তাদের অন্তরে কেবল অহংকারই রয়েছে, যে পর্যন্ত তারা পৌঁছতে সক্ষম হবে না।'

অর্থাৎ এমন মাহাত্ম্যবোধ যা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকর্মের কারণ হয়ে থাকে। অতঃপর সে ক্রিয়াকর্মকে অহংকার বলা হয়। অর্থাৎ, যখন কারও কাছে তার নিজের মর্যাদা অপরের চেয়ে বড় সাব্যস্ত হয়, তখন সে অপরকে হেয় জ্ঞান করে তার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইবে। তার কাছে বসা, তার সাথে আহারে শরীক হওয়া অপছন্দ করবে। অহংকারের মাত্রা বেশী হলে মনে করবে, এ লোকটির উচিত আমার সামনে গোলামের মত নত হয়ে দাঁড়ানো।

অহংকারের অনিষ্ট খুব মারাত্মক। এর কারণে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ধ্বংস হয়ে যায় এবং আবেদ, সংসারত্যাগী এবং শিক্ষিত লোকগণ কমই এ থেকে মুক্ত থাকে, জনসাধারণের তো কথাই নেই। অহংকার যে ধ্বংসাত্মক, তার বড় প্রমাণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই উক্তি ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ

অর্থাৎ, 'যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে না।'

এর কারণ এই যে, অহংকারের কারণে বান্দা ঈমানের কোন চরিত্র অর্জন করতে পারে না। উদাহরণতঃ মানুষ যে পর্যন্ত অহংকারী থাকে, সে নিজের জন্যে যা প্রিয়, তা অন্য মুমিনের জন্যে প্রিয় মনে করবে না। বিনয় হল পরহেযগারদের চরিত্রের মূল বিষয়, অহংকারী ব্যক্তি তা করতে পারবে না। অহংকারে থাকা অবস্থায় কেউ হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন করতে পারবে না। সদা সত্য কথা বলতে পারবে না। ক্রোধ ও রাগ দমন করতে সক্ষম হবে না। নিজে নম্রতা সহকারে কাউকে উপদেশ দেবে না এবং অন্যের উপদেশে কান লাগাবে না। মোটকথা, এমন কোন মন্দ অভ্যাস নেই, যা অহংকারী ব্যক্তি নিজের অহংকার রক্ষার খাতিরে করতে বাধ্য না হবে। পক্ষান্তরে এমন কোন উৎকৃষ্ট গুণ নেই, যা সে নিজের মানহানির ভয়ে বর্জন না করবে। এ কারণেই বলা হয়েছে, যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে না। আর মন্দ চরিত্র কখনও একা বিদ্যমান থাকে না। কারও মধ্যে একটি মন্দ চরিত্র থাকলে সে অপরটিকে টেনে আনে।

সে অহংকার সর্বনিকৃষ্ট, যা কারও কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং সত্যকে মেনে নিতে ও তার অনুগত হতে দেয় না। এমনি ধরনের অহংকার সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ -

অর্থাৎ, 'ফেরেশতারা হাত প্রসারিত করে বলবে—বের কর তোমাদের প্রাণ। আজ তোমাদের প্রতিদান দেয়া হবে অপমানজনক শাস্তি। কারণ, তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে অসত্য বলতে এবং তার আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে।'

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ, 'যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই ঈমানদার হতাম।'

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ নরম মাটিতে ফসল উৎপন্ন হয়, পাথরে হয় না। এমনিভাবে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনম্র অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে; অহংকারীর অন্তরে করে না। লক্ষণীয়, যদি মানুষ তার মাথা অতিমাত্রায় উঁচু করে এবং ছাদ পর্যন্ত নিয়ে যায়, তবে ছাদে টক্কর লেগে তার মাথাই চূর্ণ হবে। আর যে ব্যক্তি নুয়ে থাকবে, সে ছাদ দ্বারা আরাম ও ছায়া সবই পাবে।

যার সাথে অহংকার করা হয়, তার স্তর এবং অহংকারের ফল ঃ

মানুষ মজ্জাগতভাবে যালেম ও মূর্খ বিধায় সে কখনও স্রষ্টার সাথে এবং কখনও সৃষ্টির সাথে অহংকার করে। এদিক দিয়ে অহংকার তিন প্রকার। প্রথম, আল্লাহর সাথে অহংকার। এটা সর্বনিকৃষ্ট অহংকার। এর কারণ কেবল মূর্খতা ও অবাধ্যতাই হয়ে থাকে। যেমন নমরূদ

অহংকারবশত স্থির করেছিল যে, সে আল্লাহর সাথে লড়াই করবে অথবা যেমন অভিশপ্ত ফেরাউন খোদায়ী দাবী করেছিল। সে আল্লাহর বান্দা হতে অস্বীকার করেছিল। এই প্রকার অহংকার সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ -

অর্থাৎ, 'ঈসা মসীহ এবং নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ আল্লাহর বান্দা হওয়াকে অপছন্দ করে না। যে কেউ তাঁর বান্দা হওয়াকে অপছন্দ করবে এবং যারাই আমার এবাদত করতে অহংকার করবে, তারা জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।'

দ্বিতীয়, রসূলগণের সাথে অহংকার করা। অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে সম্মানী ও উচ্চ জ্ঞান করে তাদের মতই কোন ব্যক্তির অনুসারী হতে অস্বীকার করে। এই অহংকার কখনও চিন্তাভাবনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ, রেসালত কি, তা চিন্তাই করা হয় না। এ কারণেই সর্বক্ষণ অহংকারের দরুন মূর্খতার মধ্যে থেকে আনুগত্য করে না এবং নিজেকে সত্যপন্থী বলে ধারণা করতে থাকে। কখনও চিন্তা-ভাবনা করে; কিন্তু মন রসূলগণের আনুগত্য করে না। আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে কাফেরদের অনেক উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তারা বলত ঃ

اَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِّثْلِنَا -

অর্থাৎ, 'আমরা কি আমাদের মতই মানুষকে মেনে নেব?'

اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

অর্থাৎ, 'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ।'

لَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخَاسِرُوْنَ

অর্থাৎ, 'যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের অনুগত হয়ে যাও, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ -

অর্থাৎ, 'যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা করে না, তারা বলে, আমাদের প্রতি ফেরেশতা অবতীর্ণ হল না কেন অথবা আমরা পরওয়ারদেগারকে দেখে নিতাম। তারা মনের মধ্যে খুব অহংকার পোষণ করে।'

ফেরাউন সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ بِغَيْرِ الْحَقِّ

অর্থাৎ, 'সে নিজে এবং তার বাহিনী পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করেছে।'

ফেরাউন আল্লাহ ও রসূল উভয়ের সাথে অহংকার করেছিল। সেমতে হযরত ওয়াহাব (রহঃ) বলেন ঃ হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনকে বলেছিলেন ঃ তুমি ঈমান আন। তোমার রাজত্ব তোমার হাতেই থাকবে। ফেরাউন বলল ঃ আমি হামানের সাথে পরামর্শ করে নিই। হামানকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ এখন তো আপনি উপাস্য। লোকজন আপনার উপাসনা করে। ঈমান আনলে আপনি দাস হয়ে যাবেন এবং অন্যের উপাসনা করবেন। অতঃপর ফেরাউন আল্লাহ তা'আলার দাস হতে এবং মূসা (আঃ)-এর অনুসরণ করতে অস্বীকার করল। মক্কার কোরায়শদের উক্তি কোরআন পাক এভাবে উল্লেখ করেছে ঃ

لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

অর্থাৎ, 'এই কোরআন মক্কা ও তায়েফ এ দুই জনপদের কোন মহান ব্যক্তির উপর নাযিল হল না কেন?'

কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ এটা ছিল ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং আবূ মসউদ ছাকাফীর উক্তি। তারা বলত, মোহাম্মদ তো একজন এতীম বালক। তাকে আল্লাহ কিরূপে আমাদের নবী করলেন? কোন বড় সরদার ব্যক্তিকে নবী করলেন না কেন? আল্লাহ তাদের জওয়াবে বলেন ঃ

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

অর্থাৎ, 'তারাই কি আপনার প্রভুর রহমত বন্টন করে?'

কোরায়শরা রসূলে করীম (সাঃ)-কে আরও বলেছিল, আমরা আপনার দরবারে কিরূপে বসতে পারি? এখানে তো দরিদ্র মুসলমানরা সব সময় আনাগোনা করে। তাদের এই হেয় জ্ঞান করার জওয়াবে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

অর্থাৎ, 'আপনি তাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন না, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রভুকে ডাকে। তারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।'

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ -

অর্থাৎ, 'আপনি নিজেকে তাদের সাথে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রভুকে ডাকে। তারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। আপনার চক্ষু যেন তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র না যায়।'

মোটকথা, কতক কোরায়শ কাফের এমন ছিল, যারা অহংকারের কারণে চিন্তাভাবনা থেকে বিরত ছিল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সত্য নবী ছিলেন, এ বিষয়ে মূর্খ ছিল। আবার কতক এমন ছিল, যারা জানত তিনি সত্য নবী; কিন্তু অহংকারের কারণে মুখে তা স্বীকার করত না। আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا

অর্থাৎ, 'যখন তাদের কাছে তাদের জানা বিষয় আগমন করল, তখন তারা অস্বীকার করে বসল।' এই দ্বিতীয় প্রকার অহংকার প্রথম প্রকারের চেয়ে কম হলেও তার কাছাকাছি।

তৃতীয়, বান্দার সাথে অহংকার করা, অর্থাৎ নিজেকে বড় ও অপরকে হেয় জ্ঞান করার কারণে কারও আনুগত্য না করা। এটা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার অহংকারের তুলনায় কম হলেও দু'কারণে খুবই মারাত্মক। প্রথম কারণ, বড়ত্ব, মাহাত্ম্য ও ইযযত সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্যেই শোভনীয়। বান্দা দুর্বল ও অক্ষম বিধায় তার অহংকার করা উচিত নয়। অতএব, বান্দা যখন অহংকার করে, তখন সে যেন আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণে তাঁর অংশীদার হতে চায়। এটা মাথায় বাদশাহের মুকুট পরিধান করে কোন গোলামের সিংহাসনে বসে পড়ার মত। এখানে চিন্তা করা দরকার যে, বাদশাহ এরূপ গোলামের প্রতি কতটুকু ক্রুদ্ধ হবেন। কেননা, গোলামের কাজটি নিরতিশয় ধৃষ্টতাপূর্ণ। এ কারণেই এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন ঃ মাহাত্ম্য আমার পরিধেয় এবং অহম আমার চাদর। এতে যে আমার সাথে বিরোধ করবে, আমি তাকে চুরমার করে দেব। বান্দার সাথে অহংকার করা আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য বিধায় যে ব্যক্তি বান্দার সাথে অহংকার করবে, সে আল্লাহর সাথে বিরোধকারী সাব্যস্ত হবে। এটা নিঃসন্দেহে মারাত্মক অপরাধ।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, অহংকারের কারণে মানুষ আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধানের বিরোধিতা করতে বাধ্য। কেননা, অহংকারী ব্যক্তি যখন কারও মুখ থেকে সত্য কথা শুনে, তখন অহংকারবশত তা মেনে নেয় না; বরং অস্বীকার করতে তৎপর হয়ে উঠে। এ কারণেই যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি ধর্মীয় ব্যাপারাদিতে মোনাযারা তথা বিতর্ক করে, তারা দাবী এটাই করে যে, নিছক সত্য আবিষ্কার করা ও তা প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু এরপর তারা সত্যকে মেনে নিতে অহংকারীদের ন্যায় অস্বীকার করে। এক পক্ষের মুখ দিয়ে সত্য প্রকাশিত হয়ে গেলে অপরপক্ষ তা মানে না এবং মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে ও তা খন্ডন করার জন্যে সচেষ্ট থাকে। এটা কাফের ও মোনাফিকদের অভ্যাস। কোরআন পাকে আছে—

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَاتَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ -

অর্থাৎ, 'কাফেররা বলল ঃ তোমরা এই কোরআন শ্রবণ করো না এবং এতে গোলমাল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা প্রবল থাক।'

যারা প্রবল হওয়ার জন্যে এবং অপরকে নিরুত্তর করে দেয়ার জন্যে বাহাস করে—সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়, তারা এই অভ্যাসে মোনাফিকদের সাথে শরীক।

মোটকথা, মানুষের সাথে অহংকার অত্যন্ত মন্দ অভ্যাস। এর কারণে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলীর সাথে অহংকার হয়ে যায়। অহংকারে বিশ্বজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন ইবলীশের কথা কোরআন মজীদে এ কারণেই উল্লিখিত হয়েছে, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে। সে বলেছিল ঃ আমি মানুষের চেয়ে উত্তম। আমি আগুন দ্বারা সৃজিত, আর মানুষ মাটির দ্বারা। ইবলীশের এই অহংকারের পরিণতিতে সে সেজদার আদেশ মানতে অস্বীকার করেছে। অতএব, তার অহংকার সূচনাতে ছিল আদম (আঃ) -এর সাথে এবং পরিণামে আল্লাহর সাথে হয়ে গেল। ফলে, সে চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে, হযরত ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি জানেন, আমি অত্যধিক পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়। এটা কি অহংকারে গণ্য হবে? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ না, এটা অহংকার নয়; বরং অহংকার হচ্ছে সত্য বিষয়ের অবাধ্য হওয়া, মানুষের দোষ অন্বেষণ করে তাদেরকে হেয় করা। অতএব যে ব্যক্তি নিজেকে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে, অন্য মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে এবং সত্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রত্যাখ্যান করে, সে বান্দার ব্যাপারাদিতে অহংকারী হবে। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করতে লজ্জাবোধ করে এবং রসূলের অনুসরণ করে বিনম্র হতে কুণ্ঠিত হয়, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারাদিতে অহংকারী হবে।

অহংকারের কারণসমূহ ঃ প্রকাশ থাকে যে, এমন লোকই অহংকার করে, যে নিজেকে বড় মনে করে। আর নিজেকে সে-ই বড় মনে করে, যে জানে তার মধ্যে কোন পার্থিব অথবা পারলৌকিক পূর্ণতার গুণ বিদ্যমান

রয়েছে। পারলৌকিক পূর্ণতা দু'টি— এলম (জ্ঞান) ও আমল (কর্ম)। অপরপক্ষে পার্থিব পূর্ণতা পাঁচটি—বংশ, সৌন্দর্য, শক্তি, ধনসম্পদ এবং বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীদের প্রাচুর্য। অতএব, এ সাতটি বিষয়ই হচ্ছে অহংকারের কারণ। নিম্নে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবে বর্ণিত হচ্ছে।

অহংকারের প্রথম কারণ এলম তথা জ্ঞান। জ্ঞানী ব্যক্তিরা দ্রুত অহংকারী হয়ে পড়ে। তাই হাদীসে বলা হয়েছে—

اٰفَةُ الْعِلْمِ الْخُيَلَاءُ

অর্থাৎ, 'জ্ঞানের বিপদ হচ্ছে অহংকার।'

অর্থাৎ, জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের মধ্যে জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে নিজেকে বড় এবং অন্যদেরকে মূর্খ ও তুচ্ছ মনে করতে থাকে। ফলে, পার্থিব কাজ-কারবারে সে নিজেকে অগ্রগণ্য মনে করে। অপরের কাছ থেকে প্রথমে সালাম পাওয়ার আশা করে। অন্যরা তার সাথে সদাচরণ করে, কিন্তু সে কারও সাথে সদাচরণ করে না। করলেও এটাকে তার প্রতি অনুগ্রহ মনে করে এবং কৃতজ্ঞতা আশা করে। আর ধর্মীয় ব্যাপারে জ্ঞানী ব্যক্তি অন্যের সাথে এভাবে অহংকার করে যে, সে নিজেকে আল্লাহর কাছে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মনে করে। ফলে অন্যের জন্যে সে যতটুকু ভয় করে, নিজের জন্যে ততটুকু করে না; বরং নিজের মুক্তির ব্যাপারে অন্যের চেয়ে বেশী আশাবাদী হয়।

বলা বাহুল্য, এরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিকে মূর্খ বলাই অধিক সঙ্গত। তাকে জ্ঞানী কে করেছে? সত্যিকার জ্ঞান তো তাকে বলে, যা দ্বারা মানুষ আল্লাহকে, নিজেকে এবং পরিণামের বিপদকে চিনে ও বুঝে। জ্ঞান দ্বারা খোদাভীতি, বিনয় ও নম্রতা বৃদ্ধি পায়। এখন প্রশ্ন হয়, জ্ঞানের কারণে কিছুসংখ্যক লোকের অহংকার ও নির্ভীকতা বেড়ে যায় কেন? এর কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত এ সকল লোক এমন জ্ঞান চর্চায় মশগুল হয়, যা কেবল নামে মাত্রই জ্ঞান— সত্যিকার জ্ঞান নয়। সত্যিকার জ্ঞান দ্বারা খোদাভীতি বৃদ্ধি পাবেই। যেমন, আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ -

অর্থাৎ 'জ্ঞানী ব্যক্তিরাই আল্লাহকে ভয় করে।'

দ্বিতীয়ত এ সকল লোক যখন জ্ঞান চর্চা করে, তখন তাদের বাতেন অর্থাৎ অন্তরদেশ সংশোধিত থাকে না; বরং কুচরিত্র দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। ফলে যে শিক্ষাই লাভ করুক না কেন, তা তাদের অন্তরে ভাল আসন পায় না। পরিণামে জ্ঞানের ফলও ভাল হয় না।

হযরত ওয়াহাব (রহঃ) এর একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ জ্ঞান হচ্ছে আকাশের পানির মত, যা পরিষ্কার ও মিষ্ট থাকে। কিন্তু বৃক্ষসমূহ আপন শিরা-উপশিরা দ্বারা যখন সেই পানিকে নিজেদের মধ্যে টেনে নেয়, তখন মূলত যে বৃক্ষের যে স্বাদ, সে পানিকে সেইভাবে বদলে নেয়। পানি পেয়ে তিক্ত বৃক্ষের তিক্ততা আরও বেড়ে যায় এবং মিষ্ট বৃক্ষের মিষ্টতাও তেমনি বৃদ্ধি পায়। জ্ঞানের অবস্থাও তদ্রূপ। যে জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে যেরূপ সাহসিকতা ও খাহেশ থাকে, সে জ্ঞান তার জন্যে তেমনি হয়ে যায়। ফলে এর কারণে অহংকারীর অহংকার এবং বিনয়ীর বিনয় বেড়ে যায়।

অহংকারের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আমল অর্থাৎ, এবাদত। অনেক সংসারত্যাগী এবাদতকারী অহংকার, ইযযত ও মানুষকে আকৃষ্ট করার প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকে না। তাদের আচরণ থেকেও পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় প্রকার কাজকর্মে অহংকার বুঝা যায়। পার্থিব কাজকর্মে যেমন তাদের কাছে মানুষের আসা, মানুষের কাছে তাদের যাওয়ার তুলনায় উত্তম বিবেচিত হয়। তারা মানুষের কাছে আশা করে যে, মানুষ তাদের অভাব-অনটন পূর্ণ করুক, সম্মান করুক, মজলিসে সবার আগে বসাক এবং পরহেযগার ও মুত্তাকীরূপে স্মরণ করুক। পারলৌকিক ব্যাপারে তাদের অহংকার এই যে, তারা নিজেদেরকে মুক্তিপ্রাপ্ত এবং অন্য সকলকে ধ্বংসপ্রাপ্ত মনে করে। অথচ বাস্তবে ধ্বংসপ্রাপ্ত তারাই?

রসূলে আকরাম (সাঃ) এক হাদীসে বলেন ঃ সব মানুষ বরবাদ হয়ে গেছে— যখন তোমরা কাউকে একথা বলতে শুন, তখন মনে কর, সর্বাধিক বরবাদ সেই হবে। যে ব্যক্তি এবাদতকারীকে আল্লাহর ওয়াস্তে প্রিয় মনে করে এবং আল্লাহর এবাদতের কারণে তার সম্মান করে, তার মধ্যে ও এবাদতকারীর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সে মুক্তি পাবে এবং আল্লাহর নৈকট্যশীল হবে। কিন্তু এবাদতকারী যেহেতু মানুষকে হেয় জ্ঞান করে

তাদের কাছে উঠাবসা করতে ঘৃণা পোষণ করত, তাই সে আল্লাহর গযবের যোগ্য হবে। আশ্চর্যের বিষয় বটে, মানুষ তো তাকে ভালবাসার কারণে তার এবাদতের মর্তবা পাবে, আর সে নিজে কি না মানুষকে হেয় জ্ঞান করার কারণে আল্লাহর অসন্তোষের পাত্র হবে। বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি অধিক গুণ্ডামির কারণে "গুণ্ডা" নামে খ্যাত ছিল। অপরদিকে অন্য এক ব্যক্তি অধিক এবাদতের কারণে, "আবেদ" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তার অধিক এবাদতের ফলস্বরূপ একখণ্ড মেঘ তাকে সর্বক্ষণ ছায়া দান করত। একদিন গুণ্ডা লোকটি আবেদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে মনে চিন্তা করল— এই আবেদ এবাদতে অনেক নাম করেছেন। আমি একজন গুণ্ডা। তার কাছে বসলে আল্লাহ আমার প্রতি রহম করতে পারেন। অতঃপর সে ভক্তি সহকারে আবেদের কাছে গিয়ে বসল। এদিকে আবেদ ভাবল— আমি তো একজন আবেদ। এই গুণ্ডা লোকটি এখানে বসল কেন? এই ভেবে সে গুণ্ডাকে সরোষে বলল ঃ চলে যা এখান থেকে! আল্লাহ তা'আলা সেই সময়ের নবীর কাছে ওহী পাঠালেন ঃ তাদের উভয়কে নতুন করে আমল করতে বল। আমি গুণ্ডাকে ক্ষমা করেছি এবং আবেদের সকল এবাদত বাতিল করে দিয়েছি। অতঃপর মেঘখন্ডের ছায়াও গুণ্ডার উপর চলে গেল।

অহংকারের তৃতীয় কারণ বংশ-মর্যাদা। যার বংশ সম্ভ্রান্ত, সে নীচ বংশের লোকদেরকে হেয় মনে করে, যদিও তারা শিক্ষা-দীক্ষা ও কর্মে বেশী হয়। কেউ কেউ বংশগত অহমিকায় এত বেশী ক্ষিপ্ত যে, তারা অন্যদেরকে গোলাম মনে করে এবং তাদের সাথে উঠা-বসা করতে ঘৃণা করে। সম্ভ্রান্ত বংশের ধার্মিক ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণও এ ব্যাধি থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এটা তাদের মধ্যে গোপন থাকে—মুখে ফুটে উঠে না। তবে ক্রোধ প্রবল হলে জ্ঞানবুদ্ধির নূর বিলীন হয়ে যায়। তখন অহংকার কথাবার্তায়ও ফুটে উঠে।

এক রেওয়ায়েতে হযরত আবূ যর (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তির সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়। ক্রোধের আতিশয্যে আমি তাকে বলে বসলাম—হে কৃষ্ণকায় নারীর সন্তান! রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ হে আবূ যর!

طف الصاع طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل

অর্থাৎ, 'উভয় পাল্লা সমান। কৃষ্ণকায় নারীর সন্তানের উপর শ্বেতকায় নারীর সন্তানের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।'

আবূ যর বলেন ঃ একথা শুনে আমি মাটিতে শুয়ে পড়লাম এবং লোকটিকে বললাম ঃ তুমি আমার গণ্ডদেশকে পদতলে পিষ্ট কর। এখানে লক্ষণীয় যে, হযরত আবূ যর যখন নিজেকে শ্বেতকায় মহিলার সন্তান বলে গর্ব করলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে কিভাবে সতর্ক করে দিলেন। আরও লক্ষণীয়, তিনি কিভাবে তওবা করলেন এবং মন থেকে অহংকার মূলোৎপাটন করে দিলেন। তিনি বুঝে নিলেন, ইযযতের শিকড় যিললত ছাড়া উৎপাটিত হয় না। তাই যার সাথে অহংকার করেছিলেন, তারই পদতলে আপন গণ্ডদেশ স্থাপন করলেন।

অহংকারের চতুর্থ কারণ রূপ-লাবণ্য। এ কারণটি মহিলাদের মধ্যে অধিক পাওয়া যায়। এই অহংকারের ফলে অপরের দোষ-ত্রুটি ও গীবত মুখে উচ্চারিত হয়ে যায়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার এক মহিলা রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে আগমন করলে আমি হাতের ইশারায় বললাম ঃ "বেঁটে"। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আয়েশা, তুমি তার গীবত করেছ। বলা বাহুল্য, গোপন অহংকারই ছিল এর কারণ। হযরত আয়েশা নিজে যদি বেঁটে হতেন, তবে মহিলাকে বেঁটে বলতেন না। অতএব, তিনি যেন নিজের দেহাবয়বকে উত্তম জ্ঞান করেছেন। এর বিপরীতে মহিলাকে খর্বাকৃতির মনে করে বেঁটে বলে দিয়েছেন।

পঞ্চম কারণ ধন-সম্পদ। এ ধরনের অহংকার রাজা-বাদশাহরা তাদের ধন-ভাণ্ডার নিয়ে, ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যসামগ্রী নিয়ে, গ্রামীণ লোকেরা তাদের ভূ-সম্পত্তি নিয়ে এবং সাজ-সজ্জাকারীরা তাদের পোশাক ও যানবাহন নিয়ে করে থাকে। সুতরাং ধনাঢ্য ব্যক্তি নিঃস্ব ব্যক্তিদের সাথে অহংকার করে বলে ঃ মিয়া, তুমি তো ভিখারী-মিসকীন। আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে কিনে নিতে পারি। ধনাঢ্যতার বিপদ ও দারিদ্র্যের ফযীলত

সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই ধনীরা এসব কথা বলে। কোরআন পাকে এই ফযীলতের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে—

فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا

অর্থাৎ, 'অতঃপর কথাবার্তায় সে তার সঙ্গীকে বলল ঃ আমার কাছে তোমার চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ এবং অধিক জনশক্তি আছে।'

সঙ্গী জওয়াব দিল ঃ

ان ترن انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربى ان يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا

অর্থাৎ, 'যদি তুমি আমার ধন ও জন কম দেখ, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। আমি আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে কল্যাণ দান করবেন, যা তোমার বাগ-বাগিচার চেয়ে উত্তম হবে এবং তোমার বাগানের উপর আকাশ থেকে অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করবেন, ফলে তা হয়ে যাবে বৃক্ষহীন ময়দান অথবা তার পানি শুকিয়ে যাবে। অতঃপর তা খোঁজাখুঁজি করেও পাবে না।

কারূনের অহংকারও তেমনি ছিল। সে যখন খুব সাজগোছ করে সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে হাযির হত, তখন তারাও তার মত ধন-সম্পদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতে লাগল।

অহংকারের ষষ্ঠ কারণ দৈহিক শক্তি-বল, যা নিয়ে দুর্বল ও অসমর্থদের সাথে অহংকার করা হয়।

সপ্তম কারণ অনুগামী, সাহায্যকারী, মুরীদ, চাকর-নওকর, পরিবার ও আত্মীয়বর্গের সংখ্যাধিক্য। রাজা-বাদশাহরা অধিক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এবং শিক্ষিতরা অধিক শিষ্য নিয়ে অহংকার করে– যদিও তাদের সৈন্য সামন্ত ও শিষ্যবর্গ ধ্বংস ও আযাবের কারণ হয়।

অহংকারের প্রতিকার ও বিনয় অর্জনের উপায় ঃ উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, অহংকার একটি ধ্বংসমূলক বিষয়। খুব

কম মানুষই এ থেকে মুক্ত। এই অহংকার দূর করা ফরযে আইন। কেবল বাসনা করলেই এটা দূর হবে না; বরং এমন ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে, যা তাকে সমূলে উৎপাটিত করে দেয়। দ্বিবিধ উপায়ে এর প্রতিকার সম্ভব। এক, অন্তরে নিহিত এর মূল শিকড় উপড়ে ফেলে এবং দুই, যে সকল কারণে মানুষ অহংকার করে, সেগুলোকে দূর করে। মূল শিকড় উপড়ে ফেলার জন্যে দু'রকম চিকিৎসা দরকার— একটি শিক্ষাগত ও অপরটি কর্মগত। শিক্ষাগত চিকিৎসা এই যে, মানুষ নিজেকে চিনবে এবং আল্লাহ তা'আলাকে চিনবে। এতেই ইনশাআল্লাহ অহংকার দূর হয়ে যাবে। কেননা, মানুষ যখন নিজেকে যথাযথরূপে চিনবে, তখন বিশ্বাস করবে যে, সে নিজে সকল হেয় বস্তুর চেয়েও হেয়তম এবং সকল সামান্য বস্তুর চেয়েও সামান্যতম। অনুনয়, বিনয় ও লাঞ্ছনা ছাড়া কোন কিছুই তার প্রাপ্য নয়। এরপর যখন আল্লাহ তা'আলাকে চিনবে, তখন জানতে পারবে বড়ত্ব ও মহত্ত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারও জন্যে শোভনীয় নয়।

আল্লাহকে চিনা ও তার মাহাত্ম্য অনুধাবন করার বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। কেননা, এটাই এলমে মুকাশাফার চূড়ান্ত সীমা। যদিও আত্মজ্ঞান অর্জন করাও দীর্ঘ ব্যাপার। কিন্তু আমরা এখানে এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে এতটুকু আলোচনা করব, যতটুকু বিনয় অর্জনের ক্ষেত্রে উপকারী। বলা বাহুল্য, এর জন্যে কোরআন পাকের একটি আয়াতের গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে নেয়াই যথেষ্ট। আয়াতটি এই ঃ

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهٗ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهٗ
فَقَدَّرَهٗ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهٗ -

অর্থাৎ, 'মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত যে অকৃতজ্ঞ! তিনি তাকে কি বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? বীর্য দ্বারা তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরে তার বিকাশ সাধন করেছেন, অতঃপর তার জন্যে পথ সহজ করে দিয়েছেন, অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং কবরস্থ করেন। এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনরুত্থিত করবেন।

এ আয়াতে মানুষের প্রথম সৃষ্টি, পরিণতি ও মধ্যবর্তী অবস্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে। মানুষ এসব অবস্থা চিন্তা করলে আয়াতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়ে যাবে।

উদাহরণতঃ প্রথম অবস্থায় মানুষের কোন উল্লেখও ছিল না। সে ছিল নাস্তির পর্দায় আবৃত। দীর্ঘকাল এ অবস্থাই অব্যাহত থাকে। নাস্তির সূচনা কখন হয়েছে, তাও জানা নেই। যে বস্তু অস্তিত্বহীন, তার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত আর কি হবে? জন্মের পূর্বে মানুষ এরূপই ছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে একটি হীন বস্তু অর্থাৎ মৃত্তিকা দিয়ে গড়ে তুলেন এবং অপবিত্র বস্তু অর্থাৎ বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করেন। অতঃপর বীর্য থেকে জমাট রক্ত এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেন। এরপর অস্থি গঠন করেন এবং অস্থিকে মাংস ও ত্বকের আবরণ দান করেন। এ সব স্তর অতিক্রম করার পর মানুষ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য হয়েছে। এরপরও জন্মের সাথে সাথে তার মধ্যে অনেক নিচ স্বভাব বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ, প্রথমে তাকে পাথরের ন্যায় জড় অবস্থায় সৃষ্টি করা হয়। সে কোন কিছু শুনত না, দেখত না, হৃদয়ঙ্গম করত না, নড়াচড়া করত না, কথা বলত না এবং কোন কিছু ধরত না। এক কথায়, সে যেন জীবন্ত ছিল না। সে ছিল শক্তিশালী হওয়ার পূর্বে নিঃশক্তি, জ্ঞানী হওয়ার পূর্বে অজ্ঞান, চক্ষুষ্মান হওয়ার পূর্বে অন্ধ, শ্রবণকারী হওয়ার পূর্বে বধির, বক্তা হওয়ার পূর্বে মূক, পথপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে পথভ্রষ্ট এবং সমর্থ হওয়ার পূর্বে অসমর্থ।

مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ

পর্যন্ত আয়াতে এ কথাই বুঝানো হয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে-

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا
مَّذْكُوْرًا اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ -

অর্থাৎ, জীবন লাভের পূর্বে কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন মানবসত্তা উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত বীর্য থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্যে। বলা বাহুল্য, এখানেও পূর্বোক্ত বক্তব্য বিধৃত হয়েছে।

সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তা'আলা মানুষের পথ সহজ করে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যা ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে। এতে মানুষ আমৃত্যু যা কিছু অর্জন করে, তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا-

অর্থাৎ, 'তাকে সৃষ্টি করেছি মিলিত বীর্য থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্যে। অতঃপর আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি। হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ।'

সুতরাং যে মানুষের জন্ম ও জন্ম পরবর্তী অবস্থা এই, তার জন্যে গর্ব ও অহংকার করা কেমন করে বৈধ হবে? সে তো বাস্তবে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর এবং দুর্বল থেকে দুর্বলতম সত্তা। হাঁ, মানুষ যদি পূর্ণাঙ্গ সৃজিত হত, তার সব কাজ তারই এখতিয়ারভুক্ত থাকত এবং সে আপন ক্ষমতায় চিরঞ্জীব হত, তবে আপন সূচনা ও পরিণতি বিস্মৃত হয়ে অবাধ্য ও অহংকারী হওয়া তার জন্যে শোভা পেত। কিন্তু এখন অবস্থা অন্য রকম। তার স্বল্পকালীন জীবনে মারাত্মক রোগ-ব্যাধি এবং বিভিন্ন বিপদাপদ তাকে ঘিরে রাখে। ক্ষুধা, পিপাসা, জরামৃত্যু আরও কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাকে দিন অতিবাহিত করতে হয়। নিজের লাভ-লোকসান, ইষ্ট ও অনিষ্টের এখতিয়ার তার নেই। সে অনেক কিছু জানতে চায়; কিন্তু অজ্ঞ থাকে। অনেক কিছু বিস্মৃত হতে চায়, কিন্তু পারে না। সার কথা, মানুষের অন্তর ও মন তার আয়ত্তের বাইরে। সে এমন বস্তু কামনা করে, যাতে তার ধ্বংস নিহিত এবং এমন বস্তুকে বর্জন করতে চায়, যাতে তার জীবন লুক্কায়িত। সে এমন খাদ্যকে সুস্বাদু মনে করে, যা খেয়ে বদহজমিতে ভোগে, মৃত্যুবরণ করে এবং তিক্ত ঔষধ, যা উপকারী ও জীবনদানকারী, তা খেতে চায় না। এমতাবস্থায় সে যদি নিজেকে চিনে, তবে অবশ্যই জানতে পারবে যে, তার চেয়ে হীন ও নিকৃষ্ট আর কিছু নেই। সুতরাং অহংকার করা মূর্খতা বৈ নয়।

এরপর যখন মানুষের মৃত্যু হবে, তখন সে পূর্বে যেরূপ জড় পদার্থ ছিল, তেমনি জড় পদার্থে পরিণত হবে। সে হবে একটি চেতনা ও অনুভূতিহীন কাঠামো। তাকে মাটিতে পুঁতে রাখা হবে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গলে যাবে, অস্থিসমূহ পচে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বিভিন্ন কীট কিলবিল করে তার দেহকে খেয়ে ফেলবে। তখন কোন প্রাণী তার কাছে ভিড়বে না। মানুষ তাকে নাপাক মনে করবে এবং তীব্র দুর্গন্ধের কারণে তার কাছ থেকে দূরে পালাবে। কত ভাল হত যদি এই অবস্থায় মাটি হয়ে যাওয়ার পর সে মুক্তি পেত। কিন্তু এখানেই কাহিনীর শেষ নয়। সে পুনরুজ্জীবিত হবে। দেহের বিচ্ছিন্ন অংশসমূহ পুনরেকত্রিত হয়ে সে কবর থেকে উঠবে এবং কিয়ামতকে উপস্থিত দেখতে পাবে। সে দেখবে, আকাশ বিদীর্ণ, পৃথিবী পরিবর্তিত, পর্বতমালা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, তারকারাজি নিষ্প্রভ এবং সূর্য গ্রহণে আবৃত। সর্বত্র অন্ধকারই অন্ধকার। তার সামনে আমলনামা রাখা হবে এবং বলা হবে এটা পাঠ কর। সে বলবে ঃ এটা কিসের আমলনামা? উত্তর হবে—তোমার জীবদ্দশায় তোমার কাঁধে দু'জন ফেরেশতা নিয়োজিত ছিল। তুমি যা বলতে এবং যে কাজ করতে, তা তারা লিখে রাখত। তোমার ছোট-বড় সকল আমল এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তুমি ভুলে গেলে কি হবে, আল্লাহ ভুলে যাননি। এখন চল এবং হিসাব-নিকাশ দাও। একথা শুনতেই সে ব্যাকুল হয়ে পড়বে। এরপর আমলনামা পাঠ করে বলবে—হায় হায়! এতে তো ছোট-বড় সকল গোনাহই বিদ্যমান। এ হচ্ছে সকল মানুষের শেষ পরিণতি, যা ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে। এখন চিন্তার বিষয় এই যে, যে মানুষের এই অবস্থা, অহংকারের সাথে তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আস্ফালন করা ও বড়াই করা তো দূরের কথা, তার তো এক মুহূর্তও আনন্দিত হওয়া উচিত নয়। এ হচ্ছে অহংকারের শিক্ষাগত চিকিৎসার বর্ণনা।

এখন কর্মগত চিকিৎসা হল, প্রকাশ্যে বিনয় অবলম্বন করা এবং সকল মানুষের সাথে বিনম্র ব্যবহার ও সদাচরণ করা। যেমন আমরা ইতিপূর্বে সৎকর্মপরায়ণদের অবস্থা বর্ণনা করেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নত ও রীতিনীতির অনুসরণ করবে। বর্ণিত আছে, তিনি মাটিতে বসে আহার

করতেন এবং বলতেন ঃ আমি আল্লাহর বান্দা। তাই বান্দার মতই আহার করি। হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি নতুন বস্ত্র পরিধান করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আমি গোলাম; যেদিন মুক্তি পাব, সেদিন নতুন পোশাক পরিধান করব। এখানে মুক্তি বলে তিনি কিয়ামতের মুক্তি বুঝিয়েছেন।

বিনয় কর্মের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। তাই আরব জাতিকে ঈমান ও নামাযের আদেশ করা হয়েছিল। কেননা, বিনয় ও নম্রতা তাদের স্বভাবের বিপরীত ছিল। এমনকি, কারও হাত থেকে বেত পড়ে গেলে তা উঠানোর জন্যে তারা নত হত না। জুতার ফিতা খুলে গেলে তা নুয়ে বেঁধে নিত না। সেমতে হাকীম ইবনে হেযাম যখন প্রথম বায়আত হয়েছিল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে শর্ত করেছিল যে, সে রুকু-সেজদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করবে। তিনি এ শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। পরে অবশ্য হাকীম বুঝতে পারে এবং পাক্কা নামাযী হয়ে কামালাতের শীর্ষে পৌঁছান। মোটকথা, আরব জাতির কাছে সেজদা করা ও নত হওয়া ছিল চরম অপমানজনক। তাই নামাযের আদেশ হয়, যাতে তাদের অহংকার চূর্ণ হয় এবং অন্তরে বিনয় আসন গাড়ে। বলা বাহুল্য, নামাযের রুকূ, সেজদা ও দণ্ডায়মান থাকার মধ্যে পুরোপুরি বিনয়ভাব বিদ্যমান রয়েছে। এদিক দিয়েই নামাযকে "ধর্মের স্তম্ভ" আখ্যা দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে অহংকারের কারণসমূহ দূর করার মাধ্যমে অহংকারের প্রতিকার করা। প্রথমত বংশ মর্যাদার কারণে যে ব্যক্তি অহংকার করে, তার দুটি বিষয় জানা উচিত। এক, বংশ নিয়ে গর্ব করা নিছক মূর্খতা। কেননা, অন্যের গুণ-গরিমা দ্বারা নিজের সম্মান হওয়া অর্থহীন। সুতরাং যে বংশের গর্ব করে, সে যদি নীচ স্বভাবের হয়, তবে অন্যের গুণ-গরিমা তার নীচ স্বভাবকে ঢেকে রাখবে কিরূপে। বরং যে ব্যক্তির বংশ নিয়ে গর্ব করে, সে জীবিত থাকলে একথাই বলত যে, শ্রেষ্ঠত্ব আমার মধ্যে রয়েছে। তুই তো আমার প্রস্রাবের কীট। তোর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব কোত্থেকে এল? দ্বিতীয় বিষয় এই যে, সে তার সত্যিকার বংশ চেনার চেষ্টা করবে এবং বাপ-দাদার কথা চিন্তা করবে। তার বাপ তো এক ফোঁটা নাপাক বীর্য এবং দাদা নিকৃষ্ট মৃত্তিকা। অতএব, যার মূল হচ্ছে নিকৃষ্ট মৃত্তিকা, যা পদতলে পিষ্ট হতে থাকে, সে অহংকার কিরূপে করতে পারে?

অহংকারের অপর কারণ রূপ-লাবণ্য। এর চিকিৎসা এই যে, মানুষ তার অভ্যন্তর ভাগকে বুদ্ধির দৃষ্টিতে দেখবে— জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় কেবল বাহ্যিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে না। অভ্যন্তর ভাগের প্রতি লক্ষ্য করলে এমন ঘৃণ্য বিষয়াদি দৃষ্টিগোচর হবে, যা দ্বারা রূপের অহংকার নিমেষে বিলীন হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ মানুষের সর্বাঙ্গ নোংরামিতে পূর্ণ। তার পেটে রয়েছে মল, মূত্রাশয়ে মূত্র, নাকে শ্লেষ্মা, মুখে থুথু, কানে ময়লা, ধমনীতে রক্ত, ত্বকে পুঁজ এবং বগলে দুর্গন্ধ। এ ছাড়া সে দিনে একবার অথবা দু'বার নিজের হাতে পায়খানা ধৌত করে এবং প্রত্যহ একবার অথবা দু'বার পেটের জঞ্জাল দূর করার জন্যে পায়খানায় যায়। পায়খানা তো দেখলেও ঘৃণা লাগে, স্পর্শ করা অথবা নাকে ঘ্রাণ নেয়া তো দূরের কথা। এ সব বিষয় মানুষের জন্যে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে, যাতে সে সর্বদা আপন নাপাকী ও নীচতা ধ্যান করতে থাকে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) আমাদেরকে আমাদের নীচতা ও অপবিত্রতা স্মরণ করাতে যেয়ে বলতেন, মনে রেখ, তোমরা প্রস্রাবের পথ দিয়ে দু'বার নির্গত হয়েছ। সুতরাং মানুষ যখন চিন্তা করবে যে, সে নোংরা বস্তু থেকে সৃজিত হয়েছে, নোংরা বস্তুর মধ্যেই জীবন কাটিয়েছে এবং মৃত্যুর পরও নোংরা বস্তুই হয়ে যাবে, তখন নিজের রূপ-লাবণ্যকে গর্বের বস্তু মনে করবে না।

অহংকারের আরও একটি কারণ হচ্ছে দৈহিক শক্তি ও বল। এর প্রতিকার এই যে, মানুষ সাধারণত যে সকল রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, সেগুলোর কথা চিন্তা করবে। উদাহরণতঃ যদি একটি শিরায়ও ব্যথা দেখা দেয়, তবে মানুষ অক্ষমদের চেয়েও হীনতম হয়ে যায়। আরও চিন্তা করা উচিত যে, যদি কোন মশা নাকে ঢুকে যায় অথবা পিঁপড়া কানে প্রবেশ করে, তবে এটাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। পায়ে কাঁটা ফুটলেও মানুষ শক্তিহীন হয়ে যায়। একদিনের জ্বরে অনেক দিনের শক্তি-সামর্থ্য বিনষ্ট হয়ে যায়। অতএব, যে ব্যক্তি একটি কাঁটাও সহ্য করতে পারে না এবং মশা ও পিঁপড়া থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না, শক্তি নিয়ে গর্ব করা তার পক্ষে শোভা পায় না।

আত্মপ্রসাদ

আত্মপ্রসাদের নিন্দা ঃ আত্মপ্রসাদের নিন্দা কোরআন পাক ও হাদীস শরীফে বিধৃত হয়েছে। সেমতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا

অর্থাৎ, হুনায়ন যুদ্ধে তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত হলে বটে, কিন্তু তা তোমাদের কোনই উপকার করেনি।

এখানে আত্মপ্রসাদ নিন্দার ভঙ্গিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا -

অর্থাৎ, তারা ধারণা করল, তাদের দুর্গসমূহ তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহর শাস্তি এমন জায়গা থেকে তাদের কাছে আসল যার কল্পনাও তারা করেনি।

এ আয়াতে কাফেরদের দুর্গ নিয়ে আত্মপ্রসাদের নিন্দা 'করা হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিনটি বিষয়কে বিনাশকারী বলে অভিহিত করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আত্মপ্রসাদ। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ দুটি বিষয় ধ্বংসাত্মক-একটি নৈরাশ্য, অপরটি আত্মপ্রসাদ। এরূপ বলার কারণ এই যে, সৌভাগ্য দুটি বিষয় দ্বারাই অর্জিত হয়– একটি চেষ্টা ও অধ্যবসায়, অপরটি কর্মতৎপরতা। নিরাশ ব্যক্তি চেষ্টা করে না, আর যে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত, সে নিজেকে সৌভাগ্যশালী বলে বিশ্বাস করে। তাই অর্জন করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ বলেন ঃ فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ

–ইবনে জুরায়জের মতে এর অর্থ কেউ যেন কোন সৎকাজ করে এ কথা না বলে যে, সে করেছে। যায়দ ইবনে আসলাম বলেন ঃ নিজেকে

সৎকর্মপরায়ণ বলে বিশ্বাস করো না। এটা আত্মপ্রসাদ। উহুদ যুদ্ধে হযরত তালহা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শত্রুর আঘাত থেকে মুক্ত রাখার জন্যে তাঁর উপর পড়ে গিয়েছিলেন, যাতে শত্রুর আঘাত তাঁর নিজের গায়েই লাগে। ফলে, তাঁর হাতের তালু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) অক্ষত ছিলেন। এটা একটা মহৎ প্রচেষ্টা ছিল বিধায় তাঁর দৃষ্টিতেও পরবর্তী সময়ে এর যথেষ্ট মাহাত্ম্য ছিল। হযরত উমর (রাঃ) নিজের অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাঁর এই আত্মপ্রসাদ জেনে নেন এবং বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্যে তালহার হাত ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পর থেকেই তার মধ্যে আত্মপ্রসাদ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এমন পুণ্যবান সাহাবীও যখন আত্মপ্রসাদ থেকে বাঁচতে পারলেন না, তখন দুর্বলচেতা মানুষ সাবধানতা অবলম্বন না করলে তাদের কি দশা হবে! হযরত মুতরিফ (রহঃ) বলেন ঃ আমি যদি সারারাত নাক ডাকিয়ে ঘুমাই এবং সকালে এই গাফলতির জন্যে অনুতাপ করি, তবে এটা সারারাত তাহাজ্জুদ পড়ে সকাল বেলায় আত্মপ্রসাদ বা আত্মতৃপ্তিতে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে ঢের উত্তম। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَخَشِيْتُ عَلَيْكُمْ مَّا هُوَ اَكْبَرُ مِنْ ذٰلِكَ الْعُجْبَ الْعُجْبَ -

অর্থাৎ, যদি তোমরা গোনাহ না কর, তবে আমি তোমাদের জন্যে এর চেয়েও মারাত্মক বিষয়ের আশংকা করি। সেটা হচ্ছে আত্মপ্রসাদ।

এখানে আত্মপ্রসাদকে সকল গোনাহের চেয়ে বড় বলা হয়েছে। বিশর ইবনে মনসুর (রহঃ) সদা এবাদতে মগ্ন থাকতেন। ফলে তাকে দেখলে আল্লাহ ও কিয়ামতের কথা স্মরণ হত। একদিন তিনি দীর্ঘক্ষণ নামায পড়লেন। জনৈক ব্যক্তি পিছন থেকে তাকে দেখল। সালাম ফিরানোর পর তিনি লোকটিকে বললেন ঃ তুমি আমার যে অবস্থা দেখেছ, তাতে আশ্চর্যান্বিত হয়ো না। অভিশপ্ত ইবলীসও ফেরেশতাদের মধ্যে থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এবাদত করেছিল। কিন্তু তার পরিণাম কি হয়েছে, তাতো তোমার অজানা নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ মানুষ

কখন খারাপ হয়? তিনি বললেন ঃ যখন সে নিজেকে ভাল মনে করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى

অর্থাৎ, তোমরা অনুগ্রহ প্রকাশ করে ও কষ্ট দিয়ে আপন সৎকর্ম বাতিল করো না।

অনুগ্রহ প্রকাশ করা হচ্ছে দানকে বড় মনে করার ফল। বলা বাহুল্য, কোন আমলকে বড় মনে করাই আত্মপ্রসাদ বা আত্মপ্রীতি। অতএব জানা গেল যে, আত্মপ্রীতি নিশ্চিতই মন্দ কাজ।

আত্মপ্রসাদের ক্ষতি ঃ আত্মপ্রসাদ অহংকারের অন্যতম কারণ বিধায় আত্মপ্রসাদ যদি আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে এর কারণে মানুষ কোন কোন গোনাহকে স্মরণই করে না। যদি স্মরণ করে, তবে তাকে সাগীরা তথা ক্ষুদ্র গোনাহ জেনে তা পূরণে সচেষ্ট হয় না; বরং মনে করে নেয় যে, এতো মাফই হয়ে যাবে। এছাড়া মানুষ নিজের এবাদত ও আমলকে বড় মনে করে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহর প্রতি অনুগ্রহ মনে করে এবং আল্লাহর নেয়ামত বিস্মৃত হয়। যখন কেউ নিজের আমলের কারণে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত হয়, তখন সে সেই আমলের বিপদ সম্পর্কে অন্ধ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি আমলের বিপদ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার অধিকাংশ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কেননা, বাহ্যিক আমল পাক-সাফ ও সংমিশ্রণমুক্ত না হলে তা খুবই কম উপকারী হয়ে থাকে। যার উপর ভয় প্রবল থাকে, সেই আমলের বিপদ খোঁজ করে। যে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত, সে অহেতুক নির্ভীক হয়ে থাকে। সে আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করে। এ কারণেই সে নিজের প্রশংসা নিজেই করতে থাকে। যে ব্যক্তি আপন মতামত ও বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে আত্মপ্রীত, সে পরামর্শ গ্রহণ ও জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়া থেকে বঞ্চিত থাকে। সে নিজের চেয়ে বড় পণ্ডিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করাকে দূষণীয় জ্ঞান করে এবং কোন উপদেশদাতার কথায় কর্ণপাত করে না; বরং অপরকে মূর্খতুল্য মনে করে। তার নিজস্ব মতামতটি যদি ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত হয়, তবে এর কারণে সে চিরতরে বরবাদ হয়ে যায়।

আত্মপ্রসাদের সংজ্ঞা ও স্বরূপ ঃ প্রকাশ থাকে যে, কোন না কোন পূর্ণতার গুণের মধ্যেই আত্মপ্রসাদ হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে কোন পূর্ণতার গুণ আছে বলে বিশ্বাস করে, তার অবস্থা ত্রিবিধ হতে পারে। এক, সেই পূর্ণতার গুণটি বিলুপ্ত হওয়ার অথবা বিকৃত হওয়ার ভয় লেগে থাকবে। এরূপ হলে তা আত্মপ্রসাদ হবে না। দুই, বিলুপ্ত হওয়ার ভয়ে ভীত থাকবে না; কিন্তু সেটিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত বলে বিশ্বাস করবে। এরূপ হলেও তাকে আত্মপ্রসাদ বলা হবে না। তিন, বিলুপ্ত হওয়ারও ভয় থাকবে না এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত বলেও বিশ্বাস করবে না; বরং সেটিকে নিজস্ব কৃতিত্ব ও গুণ মনে করেই আনন্দিত হবে। একেই বলা হবে আত্মপ্রসাদ। অতএব, আত্মপ্রসাদের সংজ্ঞা এই দাঁড়াল যে, কোন পূর্ণতার গুণকে বড় মনে করে প্রসন্ন হওয়া এবং সেটি যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি দান, একথা বেমালুম ভুলে যাওয়া। এর সাথে যদি আল্লাহর উপর প্রতিদান দেয়া হক হয়ে গেছে বলে মনে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে, তবে তাকে বলা হবে গর্ব, যা আত্মপ্রসাদের উপরের স্তর। দুনিয়াতেও এমনটি হয় যে, এক ব্যক্তি কাউকে কোন কিছু দিয়ে সেটাকে বড় কাজ মনে করে। এতটুকুতে কেবল আত্মপ্রসাদ হয়। কিন্তু যদি সে এই দেয়ার বদলে তার কাছে কোন খেদমত আশা করে, তবে একে বলা হয় গর্ব। আল্লাহ বলেন ঃ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ – কারও প্রতি বেশী পাওয়ার আশায় অনুগ্রহ করো না।

এই আয়াতের তাফসীরে হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ আপন কর্ম দ্বারা গর্ব করো না। হাদীসে আছে—গর্বকারীর নামায তার মাথা অতিক্রম করে না; অর্থাৎ আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। মোটকথা, যে গর্ব করে, সে আত্মপ্রদাসও অনুভব করে। কিন্তু যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে, তার জন্যে গর্ব করা জরুরী নয়। কেননা, আত্মপ্রসাদ হয় কেবল নেয়ামতকে বড় জানা এবং নেয়ামতদাতাকে ভুলে যাওয়া দ্বারা। এতে প্রতিদান আশা করার শর্ত নেই। অপরপক্ষে প্রতিদান আশা করা ছাড়া গর্ব হয় না। সুতরাং কেউ যদি কবুল হওয়ার আশায় দোয়া করে, অতঃপর কবুল না হওয়াকে মনে মনে খারাপ বিশ্বাস করে, তবে সে গর্বকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আত্মপ্রসাদের প্রতিকার ঃ জানা উচিত যে, প্রত্যেক রোগের প্রতিকার হবে তার কারণের বিপরীত কারণকে সম্মুখে আনা। আত্মপ্রসাদের কারণ যেহেতু অজ্ঞতা, তাই তার প্রতিকার হবে সেই জ্ঞান, যা অজ্ঞতার বিপরীত। অজ্ঞতাবশত যে সকল বিষয় নিয়ে মানুষ আত্মপ্রসাদে লিপ্ত হয়, সেগুলো মোটামুটি আট প্রকার।

প্রথম, রূপ, সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য, অঙ্গসৌষ্ঠব ইত্যাদি নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা। এর চিকিৎসা তাই, যা আমরা রূপলাবণ্য নিয়ে অহংকার করার বেলায় উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ, নিজের আদি-অন্ত অপবিত্রতার কথা চিন্তা করবে এবং অনুধাবন করবে যে, এর আগে কত অপরূপ সৌন্দর্যশালীরা মাটিতে মিশে গেছে এবং কবরে তাদের দেহ কেমন দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়, শক্তিসামর্থ্য নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা ; যেমন কোরআনে উল্লিখিত আদ সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছিল ঃ مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً 'আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর আর কে?' এর চিকিৎসা এ কথা হৃদয়ঙ্গম করা যে, একদিনের জ্বরে শক্তিশালী মানুষ নিঃশক্তি হয়ে যায়।

তৃতীয়, আপন বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা। এর ফলে মানুষ নিজের মতামতকে বহাল রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং যে তার বিরুদ্ধে বলে, তাকে মূর্খ জ্ঞান করে। এর চিকিৎসা হল, স্রষ্টার পক্ষ থেকে যে বুদ্ধিমত্তা দান করা হয়েছে, তজ্জন্যে তাঁর শোকর করবে এবং চিন্তা করবে যে, তার মস্তিষ্কে সামান্য রোগ দেখা দিলে এমন পাগল হয়ে যেতে পারে, যার পেছনে বালকেরা হাসি-তামাশা করবে। এছাড়া নিজের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান-গরিমাকে কম মনে করবে। মনে রাখবে, যার বুদ্ধিমত্তায় ত্রুটি থাকে, সে নিজে কখনও সেই ত্রুটি জানতে পারে না।

চতুর্থ, বংশমর্যাদা নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা। যেমন কতক সৈয়দ বংশীয় ব্যক্তি আত্মপ্রসাদবশত মনে করে, বংশ-গরিমা এবং পূর্বপুরুষদের দৌলতে তাদের মাগফেরাত হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ মনে করে, সকল মানুষ তাদের বাঁদী-গোলাম। এর চিকিৎসা একথা চিন্তা করা যে, আমি কর্ম ও চরিত্রে বংশের কৃতী পুরুষদের বিরুদ্ধাচরণ করেছি। এ সত্ত্বেও

ধারণা করি যে, তাদের স্তরে পৌঁছে গেছি। এটা নিছক মূর্খতা। আমার গুরুজনদের মধ্যে তো আত্মপ্রসাদ ছিল না; বরং তারা নিজেদেরকে তুচ্ছ এবং সকল মানুষকে বড় মনে করতেন। আল্লাহর আনুগত্য ও উত্তম অভ্যাস দ্বারাই তো তারা গৌরব অর্জন করেছিলেন— বংশমর্যাদা দ্বারা নয়। অতএব, আমাকেও সেই গৌরব অর্জন করতে হবে। গৌরব খোদাভীতি দ্বারা অর্জিত হয়। বংশমর্যাদা দ্বারা নয়। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানী, যে অধিক খোদাভীরু।

এ আয়াতের শানে নুযূল এই যে, মক্কা বিজয়ের দিন হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিলে হারেছ ইবনে হেশাম, সোহায়ল ইবনে উমর ও খালেদ ইবনে উসায়দ সবিস্ময়ে বলল ঃ এই কাফ্রী ক্রীতদাস আযান দেয়! কোরআন পাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি নিকট-আত্মীয়দেরকে সতর্ক করার আদেশ অবতীর্ণ হলে তিনি একজন একজন করে সকলকে নাম ধরে ডাকলেন। এমনকি বললেন ঃ হে মোহাম্মদ তনয়া ফাতেমা এবং সফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব, তোমরা নিজের জন্যে নিজেই আমল কর। এটা মনে করো না যে, আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারব। যে ব্যক্তি এসব বিষয় অনুধাবন করবে, সে কখনও বংশমর্যাদার অহমিকায় লিপ্ত হবে না।

পঞ্চম, যালেম রাজা-বাদশাহের বংশধর প্রকাশ করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা। এটাও চরম মূর্খতা এবং এর চিকিৎসা এই যে, সেই রাজা-বাদশাহদের যুলুম ও অত্যাচারের কথা চিন্তা করবে এবং এর কারণে তারা যে আল্লাহর গযবে পতিত হয়ে দোযখের ইন্ধন হয়ে গেছে একথাও চিন্তা করবে। কিয়ামতে তাদের দুরবস্থার একটি চিত্রও কল্পনা করবে যে, তারা যে সব লোকের উপর যুলুম করেছিল, তারা তাদেরকে জড়িয়ে ধরবে এবং মাথার চুল ধরে উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এটা কল্পনা করলে নিজেই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে এবং বলবে—শূকর ও কুকুরের সাথে আত্মীয়তা ভাল— এদের সাথে নয়। মোটকথা, যালেম রাজা-বাদশাহদের বংশধরকে যদি আল্লাহ যুলুম থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, তবে

তারা তজ্জন্যে শোকর করবে। তাদের পিতৃপুরুষ মুসলমান হলে তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

ষষ্ঠ, অধিক সন্তান-সন্ততি, চাকর-নওকর ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা; যেমন হুনায়ন যুদ্ধে মুসলমানরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বলেছিল, আজ আমরা পরাজিত হব না। এর প্রতিকার এটা ধ্যান করা যে, সকলেই আল্লাহর অক্ষম বান্দা। কেউ নিজের লাভ-লোকসানের মালিক নয়। আল্লাহ বলেন ঃ

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, অনেক ক্ষুদ্র দল আল্লাহর আদেশে বৃহৎ দলের উপর বিজয়ী হয়েছে।

সপ্তম, ধন-সম্পদ নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা। যেমন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার দেখলেন, জনৈক ধনী ব্যক্তির কাছে এক ফকীর এসে বসতেই সে তার কাপড় টেনে সংকুচিত হয়ে বসল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ধনী ব্যক্তিকে বললেন ঃ তুমি কি আশংকা কর যে, তার দরিদ্রতা তোমার মধ্যে সংক্রমিত হয়ে যাবে? বলা বাহুল্য, এটা ছিল ধনের আত্মপ্রসাদ। এর চিকিৎসা এই যে, ধন-সম্পদের বিপদাপদ, এতে অপরের হকের আধিক্য, ফকীরদের ফযীলত এবং জান্নাতে তাদের অগ্রগামিতার কথা চিন্তা করবে। আরও চিন্তা করবে যে, ধন-দৌলত সকালে আসে, বিকালে চলে যায়। এর কোন মৌলিকতা নেই। অনেক কাফেরও অগাধ ধন-সম্পদের মালিক।

অষ্টম, আপন ভ্রান্ত মত নিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা। এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا

অর্থাৎ, যার জন্যে তার কুকর্মকে সুসজ্জিত করা হয়। অতঃপর সে তাকে সৎকর্ম দেখে।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا

অর্থাৎ, 'তারা ধারণা করে যে, তারা খুব সৎকর্ম করছে।

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— ভ্রান্ত মত নিয়ে আত্মপ্রসাদ এ উম্মতের শেষ যুগে হবে। এ সর্বনাশা বদ অভ্যাসের কারণে পূর্ববর্তী উম্মতরা ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ, এর কারণেই ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকেরই বিশ্বাস যে, সেই খুব জ্ঞানী। অতঃপর সে তার মত ও পথ নিয়েই খুশী থাকে। দুনিয়াতে অনেক বেদআতী ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তি আপন আপন বেদআত ও পথভ্রষ্টতাকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকে। এর কারণ এটাই যে, তারা আপন ভ্রান্ত মত নিয়ে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত।

বেদআত নিয়ে আত্মপ্রসাদ অর্থ এই, যে বিষয়ের প্রতি খাহেশ ও মন ধাবিত হয়, তাকে ভাল ও সত্য বলে ধারণা করা। এ প্রকার আত্মপ্রসাদের চিকিৎসা তুলনামূলকভাবে কঠিন। কেননা, যার মতামত ভ্রান্ত, সে তার ভ্রান্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। সুতরাং যাকে রোগই মনে করে না, তার চিকিৎসা কিরূপে করবে? কিন্তু যারা সাধক ও বিভুজ্ঞানী তারা মূর্খতা সম্পর্কে অবগত করতে পারে এবং তা দূর করতে পারে। যদি সে মূর্খতা নিয়েও আত্মপ্রসাদে মগ্ন থাকে, তবে সাধকের কথায়ও কর্ণপাত করবে না; বরং সাধককেও দোষী মনে করবে। এমতাবস্থায় তার চিকিৎসা কিরূপে হবে? তবে একটি মোটামুটি চিকিৎসা আছে। তা এই যে, প্রত্যেকেই আপন মতকে অভ্রান্ত মনে করবে না; বরং বিশ্বাস করবে যে, তার মতও ভ্রান্ত হতে পারে। এ ছাড়া বিরোধপূর্ণ মাযহাবসমূহ নিয়ে মাথা ঘামাবে না; বরং বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি দেখেন ও শুনেন। তাঁর রসূল সত্য। যা কিছু তিনি নিয়ে এসেছেন, তা সত্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে যাবতীয় পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করুন।

তৃতীয় অধ্যায়

বিভ্রান্তি

প্রকাশ থাকে যে, সাবধানতা ও সতর্কতা মানুষের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি আর বিভ্রান্তি ও অসাবধানতা দুর্ভাগ্যের সেতুবন্ধ। মানুষের প্রতি ঈমান ও মাগফেরাতের চেয়ে আল্লাহ তা'আলার বড় কোন নেয়ামত নেই এবং বক্ষের উন্মুক্ততা ছাড়া ঈমান ও মাগফেরাত লাভের কোন উপায় নেই। এমনিভাবে কুফর ও গোনাহের চেয়ে বড় কোন অনিষ্ট নেই এবং আন্তরিক অন্ধত্ব ও মূর্খতা ছাড়া অন্য কিছু এই অনিষ্টের কারণ হয় না। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে অন্তর দান করা হয়েছে, তার শানে কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ - اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَّلَاغَرْبِيَّةٍ - يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِئُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ -

অর্থাৎ, কুলঙ্গির মত, যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে রক্ষিত। কাঁচের আবরণটি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ, যা প্রজ্বলিত হয় পবিত্র যায়তুন বৃক্ষের তৈল থেকে, যা পূর্বমুখীও নয় পশ্চিমমুখীও নয়, অগ্নিসংযোগ না করলেও মনে হয় তার তৈল আলো দিচ্ছে। নূরের উপর নূর।

পক্ষান্তরে গাফেলদের অন্তরের অবস্থা এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور -

অর্থাৎ, অতল সমুদ্রের মত, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের পর তরঙ্গ, যার উপরে ঘনমেঘ, এক অন্ধকারের উপর আর এক অন্ধকার, যখন সে হাত বের করে, তখন তা দেখে না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার কোন জ্যোতি নেই।

আল্লাহ তা'আলা সাবধানী লোকদের অন্তর ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন এবং গাফেল ও বিভ্রান্তদেরকে অন্তশ্চক্ষু দান করেন না। তারা খেয়াল-খুশীকেই নিজেদের পথপ্রদর্শক মনে করে। মোটকথা, বিভ্রান্তি সকল দুর্ভাগ্যের মূল এবং সমস্ত বিনাশের উৎস বিধায় এর সেসব পথ বর্ণনা করা অত্যন্ত জরুরী, যেগুলো দিয়ে এই বিভ্রান্তি অধিক পরিমাণে আগমন করে।

গাফেল ও বিভ্রান্তদের শ্রেণী যদিও অনেক। কিন্তু চারটি শ্রেণীতে সবাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। প্রথম, আলেম, দ্বিতীয়, আবেদ, তৃতীয়, সূফী এবং চতুর্থ, ধনাঢ্য ব্যক্তি। এসব দলেরও অনেক উপদল রয়েছে এবং তাদের বিভ্রান্তির কারণসমূহও বিভিন্নরূপ। উদাহরণতঃ কোন কোন লোক শরীয়তের অস্বীকৃত কর্মকে সৎকর্ম বলে মনে করে। যেমন, অবৈধ ধন-সম্পদ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করে তাতে কারুকার্য করে এবং একে সওয়াবের কাজ মনে করে। কেউ এ ব্যাপারে পার্থক্য করে না যে, নিজের জন্যে চেষ্টা-চরিত্র করে, না আল্লাহর জন্যে করে। কেউ জরুরী কাজ বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত থাকে। আবার কেউ ফরয কাজ বর্জন করে নফল কাজে মশগুল থাকে।

নিম্নে আমরা বিভ্রান্তির নিন্দা ও স্বরূপ উদাহরণসহ বর্ণনা করার পর সর্বপ্রথম আলেম তথা শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিভ্রান্তি বর্ণনা করার প্রয়াস পাব।

বিভ্রান্তির নিন্দা ও স্বরূপ ঃ বিভ্রান্তির নিন্দার জন্যে নিম্নোক্ত দুটি আয়াতই যথেষ্ট।

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

অর্থাৎ, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে এবং বিভ্রান্ত

না করে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে বিভ্রান্তকারী শয়তান।

وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِىُّ حَتّٰى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

অর্থাৎ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ, তোমরা আমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষা করেছ এবং সন্দেহ পোষণ করেছ। মোহ তোমাদেরকে আল্লাহর আদেশ (অর্থাৎ মৃত্যু) আসা পর্যন্ত বিভ্রান্ত করে রেখেছে এবং বিভ্রান্তকারী শয়তান তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে বিভ্রান্ত করেছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ সাবধানী ব্যক্তিদের নিদ্রা কতই না চমৎকার।

মোটকথা, শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব ও মূর্খতার নিন্দায় কোরআন ও হাদীসে যা কিছু বর্ণিত আছে, সবই বিভ্রান্তির নিন্দার জন্যে দলীল। কেননা, বিভ্রান্তিও এক প্রকার মূর্খতা।

বিভ্রান্তির স্বরূপ হল শয়তানের ধোকার কারণে এমন কোন বিষয় সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা, যা মনের খেয়ালখুশী ও খাহেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন অসার ধারণার বশবর্তী হয়ে বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের কোন কল্যাণে বিশ্বাসী হয়, সে বিভ্রান্ত। অধিকাংশ মানুষই আপন কল্যাণের ধারণা রাখে। অথচ তাদের এ ধারণা ভুল। এ থেকে জানা গেল যে, অধিকাংশ মানুষই বিভ্রান্ত। তবে কোন কোন মানুষের বিভ্রান্তি অপরের তুলনায় স্পষ্টতর ও কঠোরতর হয়ে থাকে। কঠোরতর বিভ্রান্তি দু'প্রকার—কাফেরদের বিভ্রান্তি ও গোনাহগারদের বিভ্রান্তি। কোন কোন কাফেরকে পার্থিব জীবন বিভ্রান্ত করে রেখেছে এবং কতককে শয়তান। যারা পার্থিব জীবন দ্বারা বিভ্রান্ত, তারা বলে—নগদ বাকীর চেয়ে উত্তম। পার্থিব জীবন নগদ এবং পরকাল বাকী। সুতরাং পার্থিব জীবনই উত্তম এবং একেই অবলম্বন করা উচিত। তারা আরও বলে—ইহকাল নিশ্চিত এবং পরকাল সংশয়িত। নিশ্চিত বিষয় সংশয়িত বিষয়ের তুলনায় উত্তম হয়ে থাকে। সংশয়ের কারণে নিশ্চিতকে বর্জন করা

ঠিক নয়। এ ধরনের প্রমাণাদি সম্পূর্ণ অসার এবং শয়তানের প্রমাণাদির অনুরূপ। সে বলেছিল—

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ

অর্থাৎ, আমি আদমের চেয়ে উত্তম। কারণ, তুমি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে সৃষ্টি করেছ মাটির দ্বারা।

এ ধরনের বিভ্রান্তির প্রতিকার দু'প্রকারে সম্ভব। সত্যিকার ঈমান দ্বারা চিকিৎসা হল আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত উক্তিসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করা—

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে যা আছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, তা অক্ষয় থাকবে।

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

– এবং পরকাল উৎকৃষ্টতর ও চিরস্থায়ী।

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

—পার্থিব জীবন তো বিভ্রান্তির সামগ্রী বৈ নয়।

فَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

—পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে।

সেমতে রসূলে করীম (সাঃ) যখন এসব আয়াতের বিষয়বস্তু অনেক কাফের দলের গোচরীভূত করেন, তখন তারা কালবিলম্ব না করে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যায় এবং কোন দলীলের অপেক্ষা করেনি। কেউ কেউ এসে আরয করত—আমরা আপনাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, সত্যিই কি আল্লাহ আপনাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন? তিনি জওয়াবে বলতেন ঃ হাঁ। এরপরই তারা মুসলমান হয়ে যেত। সাধারণের এই ঈমান ছিল বিভ্রান্তির

গণ্ডির বাইরে। এটা এমন, যেমন কোন বালক তার পিতার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়, যদিও কারণ জানা থাকে না।

যুক্তি, প্রমাণের মাধ্যমে চিকিৎসা হল যেসব যুক্তির ভিত্তিতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, সেগুলোকে যুক্তির মাধ্যমেই খণ্ডন করা। উদাহরণতঃ উপরে কাফেরদের একটি বিভ্রান্তিকর যুক্তি উল্লিখিত হয়েছে যে, পার্থিব জীবন নগদ এবং পরকাল বাকী। আর নগদ বাকীর চেয়ে উত্তম। সুতরাং পার্থিব জীবনই অবলম্বন করা উচিত। এই যুক্তিতে দুটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য হচ্ছে পার্থিব জীবন নগদ এবং পরকাল বাকী। এ বাক্যটি নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটি (অর্থাৎ নগদ বাকীর চেয়ে উত্তম) সর্বাবস্থায় সত্য নয়। এর মধ্যেই ধোকা নিহিত। কেননা, নগদ ও বাকীর পরিমাণ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সমান সমান হলে তো বাক্যটি সত্য; কিন্তু যদি নগদ বাকীর তুলনায় পরিমাণে কম হয়, তবে বাকীই উত্তম। দেখ, যে কাফেররা উপরোক্ত যুক্তি প্রদর্শন করে, তারাই ব্যবসায়ে এক টাকা নগদ এজন্যে বিনিয়োগ করে, যাতে দশ টাকা বাকী অর্জন করতে পারে। তখন তারা বলে না যে, নগদ বাকীর চেয়ে উত্তম। সুতরাং বাকীর আশায় নগদ এক টাকা বিনষ্ট করা উচিত নয়। এমনিভাবে চিকিৎসক যদি রোগীকে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ফলমূল খেতে নিষেধ করে, তবে রোগের ভয়ে তৎক্ষণাৎ সে তা পরিত্যাগ করে। অথচ এসব খাদ্যের স্বাদ নগদ এবং রোগ-যন্ত্রণা ভবিষ্যতে ভোগ করতে হবে। ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যত সুখের আশায় জলে ও স্থলে কত বিপদাপদের ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকে এবং কারও কল্পনায় একথা আসে না যে, নগদ বাকীর চেয়ে উত্তম।

সারকথা এই যে, পরবর্তী সময়ে যদি দশ টাকা পাওয়া যায়, তবে তা এক টাকা নগদের চেয়ে উত্তম। এখন দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবনকে তুলনা করলে দুনিয়ার জীবন 'কিছুই না' বলা যায়। উদাহরণতঃ মানুষ বেশীর চেয়ে বেশী একশ' বছর বাঁচে। এ বয়সকে আখেরাতের বয়সের সাথে তুলনা করলে তা তার এক কোটি ভাগের একের সমানও হয় না। সুতরাং দুনিয়াতে কেউ এক ছেড়ে দিলে আখেরাতে লাখ লাখ; বরং অগণিত পাবে। আর যদি প্রকারের দিকে লক্ষ্য করা যায়, তবে দুনিয়ার আনন্দে সর্বপ্রকার মালিন্য, কষ্ট ও বিপদ নিহিত থাকে। কিন্তু আখেরাতের আনন্দ, নির্ঝঞ্ঝাট, স্বচ্ছ ও পাক-পবিত্র। মোটকথা, নগদ বাকীর চেয়ে

উত্তম—একথাটিই ভ্রান্ত ও ধোকা। এ ভ্রান্তির কারণ হচ্ছে শুনা কথায় বিশ্বাস করে নেয়া এবং এটা চিন্তা না করা যে, নগদ বাকীর চেয়ে উত্তম তখন, যখন উভয়ের পরিমাণ ও উদ্দেশ্য সমান হয়।

কাফেরদের আরও একটি যুক্তি হল নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ ইহকাল সন্দিগ্ধ বিষয় অর্থাৎ আখেরাতের চেয়ে উত্তম। এ যুক্তিটি প্রথমটির তুলনায় অধিকতর ঠুনকো। কেননা, এর উভয় বাক্যই ভিত্তিহীন। উদাহরণতঃ নিশ্চিত বিষয় সন্দেহযুক্ত বিষয়ের চেয়ে উত্তম—এটা তখন সত্য, যখন উভয়টি সমান হয়— অন্যথায় নয়। বলা বাহুল্য, ব্যবসায়ী ব্যক্তি কষ্ট নিশ্চিতরূপেই করে এবং তার লাভ সন্দেহযুক্ত থাকে। বিদ্যার্থী বিদ্যান্বেষণে নিশ্চিতই পরিশ্রম ও অধ্যবসায় করে এবং তার ইপ্সিত ডিগ্রী পর্যন্ত পৌঁছার বিষয়টি সন্দিগ্ধ থাকে। অনুরূপভাবে রোগী ঔষধের তিক্ততা অবশ্যই অনুভব করে। এতদসত্ত্বেও তার আরোগ্য লাভের বিষয়টি থাকে অনিশ্চিত। এসমস্ত ক্ষেত্রে সকলেই সন্দেহযুক্ত বিষয়ের জন্যে নিশ্চিত বিষয়কে বর্জন করে। ব্যবসায়ী বলে, যদি আমি ব্যবসা না করি, তবে কষ্ট করব এবং ভুখা থাকব। ব্যবসায়ে পরিশ্রম কম এবং মুনাফা বেশী। রোগী বলে, ঔষধের তিক্ততা রোগের পরিণাম অর্থাৎ মৃত্যু ভয়ের তুলনায় অনেক কম। সুতরাং যে ব্যক্তি আখেরাতের ব্যাপারে সন্দেহই করে, তার বলা উচিত— জীবনের গোণাগুণতি কয়েকটি দিন সবর করা আমার জন্যে সেসব বিষয়ের তুলনায় উত্তম, যা আখেরাত সম্পর্কে মানুষ বলে থাকে। কেননা, ধরে নেয়া যাক, যদি আখেরাত মিথ্যাই হয়, তবে তাতে আমার ক্ষতি কি? জীবনের কয়েক দিনের বিলাসই তো নষ্ট হবে। জীবন লাভের পূর্বেও তো কতকাল অতিবাহিত হয়েছে, তখন আমি বিলাস করিনি। সুতরাং ধরে নেব, আমি অস্তিত্বই লাভ করিনি। পক্ষান্তরে যদি আখেরাত সত্য হয়ে যায়, তবে অনন্তকাল পর্যন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, যা আমি সহ্য করতে পারব না।

হযরত আলী (রাঃ) জনৈক খোদাদ্রোহীকে বলেছিলেন ঃ তুমি যা বলছ, তা সত্য হলে আমাদের উভয়ের কোন ক্ষতি নেই। আর যদি আমার কথা সত্য হয়ে যায়, তবে আমি মুক্তি পাব, আর তুমি বরবাদ হয়ে যাবে। হযরত আলী (রাঃ) এরূপ বলার কারণ এটা ছিল না যে, معاذ الله তিনি

আখেরাত সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন; বরং খোদাদ্রোহীর বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন এবং বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তার আখেরাত অস্বীকার করা নিতান্তই অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত।

কাফেরদের যুক্তির দ্বিতীয় বাক্য হচ্ছে আখেরাত সন্দিগ্ধতা। মূলত এটাও ভুল; বরং আখেরাত ঈমানদারদের মতে সুনিশ্চিত। এর দলীল দ্বিবিধ। এক, ঈমান, বিশ্বাস এবং পয়গম্বর ও সুধীজনের অনুকরণ। পয়গম্বর ও সুধীজনদের অনুসরণ করলে আখেরাত সম্পর্কিত সকল বিভ্রান্তির অবসান হয়ে যায়। জনসাধারণের বিশ্বাস এমনি ধরনের। এটা এমন, যেমন কোন রোগী তার রোগের ঔষধ কি, জানে না। এরপর সকল চিকিৎসক ও কবিরাজ এ বিষয়ে একমত হয়ে গেল যে, এ রোগের ঔষধ অমুক গাছের মূল। এখন রোগী চিকিৎসকদের মুখে একথা শুনামাত্রই নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে নেবে এবং তাদের কাছে এর কোন প্রমাণ চাইবে না। আখেরাত নিশ্চিত হওয়ার দ্বিতীয় দলীল পয়গম্বরগণের জন্যে ওহী এবং ওলীগণের জন্য ইলহাম। এরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, নবী করীম (সাঃ) কেবল জিবরাঈলের কাছ থেকে শুনে আখেরাতের বিশ্বাসী হয়েছিলেন। বরং পয়গম্বরগণের জন্যে প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ হুবহু খুলে দেয়া হয় এবং তাঁরা সেই স্বরূপকে অন্তশ্চক্ষু দ্বারা এমনভাবে দেখে নেন, যেমন আমরা চর্মচক্ষু দ্বারা কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে দেখি। অতএব, তাঁরা যেসব সংবাদ দেন, স্বচক্ষে দেখে সংবাদ দেন— কেবল শুনে দেন না। সুতরাং আখেরাত সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)-এর বিশ্বাস ও আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

কোন কোন ঈমানদার ব্যক্তি যখন নিজের কথাবার্তা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে আল্লাহর বিধানাবলী অমান্য করে এবং কামনা-বাসনা ও গোনাহে লিপ্ত হয়ে সৎকর্ম বর্জন করে, তখন তারাও আখেরাত সম্পর্কিত উপরোক্ত বিভ্রান্তিতে কাফেরদের সাথে শরীক হয়ে যায়। কেননা, তারাও পার্থিব জীবনকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দেয়। অবশ্য মূল ঈমানের কারণে তারা চিরন্তন আযাব থেকে বেঁচে যাবে এবং কিছুকাল দোযখ ভোগ করার পর মুক্তি পাবে। তবে তারা যে বিভ্রান্ত, এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ,

তারা স্বীকার করে যে, আখেরাত দুনিয়ার চেয়ে উত্তম। কিন্তু দুনিয়ার প্রতি ঝোঁক থাকা এবং দুনিয়াকে অবলম্বন করার কারণে কেবল ঈমান চিরন্তন সাফল্য লাভের জন্যে যথেষ্ট নয়। কোরআন শরীফ এর সাক্ষী। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল সেই ব্যক্তির জন্যে, যে তওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, অতঃপর সৎপথে থাকে।

মোটকথা, যারা দুনিয়া নিয়েই সন্তুষ্ট, এর আনন্দ-উল্লাসে নিমজ্জিত এবং মৃত্যুকে খারাপ মনে করে, তারাই বিভ্রান্ত, কাফের হোক কিংবা মুসলমান। এ পর্যন্ত কাফেরদের বিভ্রান্তি ও তার প্রতিকার বর্ণিত হল।

এখন গোনাহগারদের বিভ্রান্তি বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা বলে—আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল। আমরা তাঁর ক্ষমা আশা করি। অতঃপর এই আশার উপর ভিত্তি করে তারা সৎকর্মও বর্জন করে। তারা এর নাম রাখে "রাজা" অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি আশাবাদ। কারণ তারা জানে "রাজা" ধর্মের একটি প্রশংসনীয় বিষয়। মাঝে মাঝে তাদের এই আশাবাদের একটি দলীল হয়ে থাকে তাদের পিতৃপুরুষদের সৎকর্মপরায়ণ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া; যেমন সৈয়দ হওয়া। খোদাভীতি ও পরহেযগারীতে পূর্বপুরুষদের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও তারা ধারণা করে যে, আল্লাহর কাছে তারা বাপ-দাদার চেয়েও বুযুর্গ। কেননা, বাপ-দাদারা খোদাভীতি ও পরহেযগারী সত্ত্বেও ভয়ে কম্পমান থাকতেন; কিন্তু তারা সকল প্রকার পাপাচার সত্ত্বেও নির্ভীক হয়ে থাকে। এটা চরম বিভ্রান্তি। তাদের মনে শয়তান এই ধারণা সৃষ্টি করেছে যে, যে কাউকে মহব্বত করে, সে তার বংশধরকেও মহব্বত করে। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তোমাদের বাপ-দাদাকে প্রিয় জানতেন, তাই তোমাদেরকেও প্রিয় জানবেন। অতএব, তোমাদের সৎকর্ম করার প্রয়োজন কি? অথচ তারা একথা স্মরণ করে না যে, হযরত নূহ (আঃ) নিজের পুত্রকে নৌকায় নিজের সঙ্গে তুলতে চেয়েছিলেন এবং দোয়া করেছিলেন—

رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ

অর্থাৎ, 'পরওয়ারদেগার, আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত।'

কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর হল—

يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

অর্থাৎ, হে নূহ! নিশ্চয় সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে তো অসৎ।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিজের পিতার জন্যে দোয়া করেন; কিন্তু তা না-মনযুর হয়। আমাদের নবী করীম (সাঃ) আপন জননীর কবর যিয়ারত এবং তার জন্যে এস্তেগফারের অনুমতি প্রার্থনা করেন। যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়; কিন্তু মাগফেরাত চাওয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়নি। সেমতে তিনি জননীর কবরের কাছে পৌঁছে শুধু অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন। মোটকথা, উপরোক্ত ধারণা ধোকা ও বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা কেবল অনুগতদেরকেই ভালবাসেন এবং গোনাহগারকে অপছন্দ করেন। যেমন, পিতা অনুগত হলে তার সন্তানরা গোনাহগার হলেও আল্লাহ পিতাকে অপছন্দ করেন না। তেমনি পিতাকে মহব্বত করার কারণে তার গোনাহগার পুত্রকেও মহব্বত করেন না। এ ক্ষেত্রে মূল কথা হচ্ছে—

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

অর্থাৎ, একজনের পাপের বোঝা অন্যজন বহন করবে না।

যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, পিতার তাকওয়া ও খোদাভীতির কারণে সেও মুক্তি পেয়ে যাবে, সে এমন, যেমন কেউ মনে করে যে, পিতা পেট ভরে খেলে তারও পেট ভরে যাবে এবং সে পানি পান করলে তারও তৃষ্ণা মিটে যাবে। অথচ এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ অবান্তর। এ থেকে জানা গেল যে, তাকওয়া ফরযে আইন। এতে পিতার তাকওয়া পুত্রের জন্যে যথেষ্ট হবে না। কিয়ামতের দিন তাকওয়ার ভিত্তিতেই বিচার হবে। তবে যে ব্যক্তির উপর আল্লাহর ক্রোধ অধিক হবে না, তার জন্যে সুপারিশের অনুমতি হবে এবং সুপারিশ তার জন্যে লাভজনক হবে।

এখন প্রশ্ন হয়, গোনাহগার ব্যক্তি বলে থাকে, আল্লাহ ক্ষমাশীল। আমি তার ক্ষমা আশা করি। তার এ দুটি বাক্যই তো নির্ভুল এবং মনে লাগে।

এতে বিভ্রান্তি কিসের? জওয়াব এই যে, শয়তান মানুষকে এমনি ধরনের বাক্য দ্বারা বিভ্রান্ত করে, যা বাহ্যত গ্রহণযোগ্য এবং ভেতরে প্রত্যাখ্যাত। বলা বাহুল্য, বাহ্যিক কথা সুন্দর না হলে মন বিভ্রান্ত হবে কেন? রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই উক্তির রহস্য ফাঁস করে দিয়েছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ বিজ্ঞ সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে অনুগত করে, মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্যে আমল করে এবং নির্বোধ সেই ব্যক্তি, যে খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয় এবং আল্লাহর কাছে আশা-আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। সুতরাং বাস্তবে এই হচ্ছে আমলহীন আশা-আকাঙ্ক্ষা, শয়তান যার নাম পাল্টে "রাজা" দিয়েছে। মূর্খরা এতেই বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। অথচ "রাজা" শব্দের ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা এভাবে করেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর রহমত আশা করে। অর্থাৎ তারাই আশা করার যোগ্য।

হযরত হাসান (রহঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কোন কোন লোক বলে– আমরা আল্লাহর কাছে আশা রাখি এবং আমল করি না। তিনি বললেন ঃ এটা তাদের খামখেয়ালী। যে ব্যক্তি কোন বস্তু আশা করে, সে তার অন্বেষণ করে। আর যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে ভয় করে, সে তার কাছ থেকে দূরে পালায়। মুসলিম ইবনে ইয়াসার বলেন ঃ আমি একদিন এত জোরেশোরে সেজদায় গেলাম যে, আমার সামনের দুটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। এটা দেখে কেউ বলল ঃ আমরা তো আল্লাহর কাছে মাগফেরাত আশা করি। এজন্যে আমল করি না। মুসলিম জওয়াব দিলেন ঃ এটা কস্মিনকালেও "রাজা" তথা আশা নয়। মানুষ যে বিষয় আশা করে, তা তালাশ করে।

এর একটি দৃষ্টান্ত এই যে, এক ব্যক্তি আশা করে যে, সে সন্তানের

পিতা হবে; অথচ সে এখনও বিবাহই করেনি কিংবা বিবাহ করে থাকলেও স্ত্রীর সাথে সহবাস করেনি। এরূপ ব্যক্তির সন্তানের পিতা হওয়ার আশা খামখেয়ালী নয় তো কি? এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও রহমত আশা করে এবং তার ঈমানই নেই কিংবা ঈমান থাকলেও সৎকর্ম করেনি কিংবা সৎকর্মের সাথে সাথে অসৎকর্মও ছাড়েনি, সেও খামখেয়ালীতে লিপ্ত।

জানা উচিত যে, আশা দু'জায়গায় করা ভাল। এক, আপাদমস্তক গোনাহগার ব্যক্তি। তার মনে যখন তওবা করার কল্পনা জাগে, তখন শয়তান তাকে এই বলে বিভ্রান্ত করে যে, তোর তওবা কবুল হবে না। এতে শয়তানের উদ্দেশ্য থাকে, তাকে নিরাশ করে দেয়া। এমতাবস্থায় নৈরাশ্য দূর করে আশা করা ওয়াজিব। সে স্মরণ করবে যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, তওবা কবুলকারী এবং তওবা একটি এবাদত, যা দ্বারা গোনাহ দূর হয়ে যায়। কোরআন শরীফে এর সমর্থন রয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم -

অর্থাৎ, বলে দিন, হে আমার বান্দা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করবেন। কারণ, তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে এস।

অতএব, মানুষ যখন তওবা সহকারে ক্ষমার আশা করবে, তখন তাকে আশাবাদী বলা উচিত হবে। নতুবা গোনাহ অব্যাহত রেখে মাগফেরাতের আশা করা খামখেয়ালী। দুই, যে ব্যক্তি নফল এবাদতে ক্রটি করে এবং কেবল ফরয এবাদত করেই ক্ষান্ত থাকে, সে যদি নিজের জন্যে আল্লাহর সেই সমস্ত নেয়ামত ও ওয়াদা আশা করে, যা তিনি সৎকর্মপরায়ণদেরকে দিয়েছেন এবং এই আশার আনন্দে নফল এবাদতের প্রতি মনোনিবেশ করে, তবে তার এই আশা উত্তম। আল্লাহ বলেন ঃ

قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكوة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لامانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ٥

অর্থাৎ, অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনরা, যারা আপন নামাযে বিনয় নম্র, যারা অসার কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাতদানে সক্রিয়, যারা আপন যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলে তারা তিরস্কৃত হবে না। কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে সে হবে সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান, তারাই হবে অধিকারী ফেরদাউসের, যাতে তারা চিরকাল থাকবে।

সুতরাং প্রথমোক্ত আশা দ্বারা তওবার প্রতিবন্ধক নৈরাশ্য খতম হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় আশা দ্বারা এবাদতে স্ফূর্তির অন্তরায় অলসতা দূর হয়ে যায়। সারকথা, যে আশা তওবা করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে বলা হয় "রাজা"। আর যে আশা এবাদতে অলসতার কারণ হয়, তাকে বলা হয় বিভ্রান্তি ও খামখেয়ালী। আজকাল অধিকাংশ লোক আমলে অলসতা করে। তারা আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আখেরাতের জন্যে চেষ্টা-চরিত্র করে না। এর কারণ এটাই যে, তারা বিভ্রান্তিতে পড়ে আছে, যাকে "রাজা" মনে করে নিয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন—এই উম্মতের শেষ যুগে বিভ্রান্তি প্রবল হবে। বাস্তবে তাই দেখা যায়। প্রথম যুগের লোকেরা অব্যাহতভাবে এবাদত করতেন। তারা যা-ই আমল

করতেন, তাদের অন্তর ভয়ে পরিপূর্ণ থাকত; অথচ তারা সারারাত আল্লাহর এবাদতে কাটিয়ে দিতেন। এতদসত্ত্বেও নির্জনে নিজের জন্য কান্নাকাটি করতেন। কিন্তু বর্তমান যুগের অবস্থা এর বিপরীত। এখন মানুষ গোনাহে ডুবে থাকে, দুনিয়া নিয়ে সদা ব্যস্ত থাকে এবং আল্লাহর প্রতি বিমুখ থাকে। এরপরও তারা শংকাহীন ও প্রশান্ত দৃষ্টিগোচর হয়। তারা বলে— আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপার উপর আস্থা রাখি এবং তাঁর রহমত ও মাগফেরাত আশা করি। তারা যেন দাবী করে আমরা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ এতটুকু জানি, যতটুকু পয়গম্বর ও সাহাবায়ে কেরাম জানতেন না।

হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এক সময় আসবে, যখন পরনের বস্ত্রের ন্যায় কোরআন মানুষের অন্তরে পুরাতন হয়ে যাবে। মানুষের কেবল আশা-আকাঙ্ক্ষাই থেকে যাবে এবং এর সাথে ভয় মোটেই থাকবে না। কোন সৎকাজ করলে তারা বলবে, এটা কবুল হবে এবং কোন অসৎকাজ করলে বলবে এটা ক্ষমা পেয়ে যাব। এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, মানুষ ভয়ের জায়গায় লালসাকে ব্যবহার করবে এবং কোরআনে উল্লিখিত ভয়ের আয়াত সম্পর্কে মূর্খ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা খৃস্টানদের এ অবস্থাই বর্ণনা করে বলেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا -

অর্থাৎ, তাদের পেছনে আগমন করল কিতাবের উত্তরাধিকারীগণ, যারা তুচ্ছ জীবনের সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।

বিভ্রান্তদের প্রকার চতুষ্টয়

(১) শিক্ষিতদের বিভ্রান্তি ঃ একদল শিক্ষিত লোক প্রচুর ধর্মীয় ও যৌক্তিক বিদ্যা শিক্ষা করে এবং তা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে না। তারা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ থেকে বিরত রাখে না এবং এবাদত পালন করে না। তারা আরও ধারণা করে– আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে মর্যাদাশীল। আল্লাহ আমাদের মত শিক্ষিতদেরকে আযাব দেবেন না; বরং সাধারণ লোকের পক্ষে আমাদের সুপারিশ কবুল করবেন। বাস্তবে এটা তাদের বিভ্রান্তি। কেননা, গভীর দৃষ্টিতে দেখলে জানা যাবে, বিদ্যা দু' প্রকার। এক, মোকাশাফা; অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলীকে জানা, যাকে পরিভাষায় 'মারেফত' বলা হয়। দুই, মোয়ামালা; অর্থাৎ, হালাল-হারাম, ভাল ও মন্দ চরিত্র, তার প্রতিকার এবং মন্দ চরিত্র থেকে আত্মরক্ষার উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা। আমল তথা কর্ম করার উদ্দেশ্যে এই দ্বিতীয় প্রকার বিদ্যা অর্জন করা হয়। আমল উদ্দেশ্য না হলে বিদ্যার কোন সার্থকতা নেই। যে বিদ্যার উদ্দেশ্য হয় আমল, সেই আমলই সেই বিদ্যার মূল্য হয়ে থাকে।

উদাহরণতঃ জনৈক রোগী একজন বিচক্ষণ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে চিকিৎসক তাকে কতগুলো বনজ ঔষধ, সেগুলোর প্রাপ্তিস্থান, চূর্ণকরণ, মিশ্রিতকরণ, প্রস্তুত প্রণালী, সেবনবিধি ইত্যাদি বিস্তারিত বলে দিল। রোগী সেগুলো শুনে সুন্দর হস্তাক্ষরে একটি ব্যবস্থাপত্র লিখে নিল। অতঃপর বাড়ী ফিরে সে প্রত্যেহ সে ব্যবস্থাপত্র পাঠ করতে শুরু করল। তা পাঠ করে শুনাল। কিন্তু ব্যবস্থা অনুযায়ী বাজার থেকে সেগুলো কিনে ঔষধ তৈরি করল না এবং সেবনও করল না। অথচ তার কাছ থেকে শুনে অনেকেই সেই ঔষধ তৈরি করে সেবন করল এবং রোগের হাত থেকে মুক্তি পেল। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির রোগমুক্তি আশা করা যায় কি? তার বিদ্যা তার কোন উপকারে আসবে কি? হাঁ, সে যদি পয়সা খরচ করে উপাদানগুলো বাজার থেকে কিনে ঔষধ তৈরি করে এবং যেভাবে সেবন করা দরকার, সেভাবে সেবন করে, সাথে সাথে নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর বস্তু আহার করা

থেকে বিরত থাকে, তবে তার রোগমুক্তি আশা করা যায়। এতেও আরোগ্য লাভ না করার সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু মোটেই ঔষধ সেবন না করে আরোগ্য আশা করা খামখেয়ালী বৈ কিছু নয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি ফেকাহ, এবাদতের বিধিবিধান ইত্যাদি বিদ্যা শিক্ষা করে; কিন্তু নিজে আমল করে না, গোনাহসমূহ জেনেও গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে না, মন্দ চরিত্র অধ্যয়ন করে এবং নিজেকে পরিশোধিত করে না এবং সচ্চরিত্রতার জ্ঞান অর্জন করে কিন্তু নিজে তা দ্বারা ভূষিত হয় না, সে নিশ্চিতই বিভ্রান্ত। আল্লাহ পাক বলেন—

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

অর্থাৎ, যে নিজেকে পরিশোধিত করবে, সেই সফল হবে।

এখানে একথা বলা হয়নি যে, যে পরিশোধনের জ্ঞান অর্জন করবে, সে সফল হবে। এক্ষেত্রে শয়তান আরও একটি ধোকা উপস্থিত করে। তা এই যে, জ্ঞানার্জনের সাথে ঔষধের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, ঔষধের জ্ঞান রোগ দূর করে না ঠিক; কিন্তু জ্ঞানার্জন খোদায়ী নৈকট্য ও সওয়াব লাভের কারণ হয়ে থাকে। সেমতে বিদ্যার ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এসব হাদীসে আমল ছাড়াই বিদ্যা অর্জনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, অজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই শয়তানের এই ধোকায় পড়ে যায়। কেননা, এটা মানসিক প্রবণতার অনুকূল। পক্ষান্তরে বিজ্ঞ ব্যক্তি শয়তানকে এই জওয়াব দেয় যে, তুই আমাকে বিদ্যার ফযীলত মনে করিয়ে দিচ্ছিস এবং অসৎ আমলহীন বিদ্বান ব্যক্তিদের সম্পর্কে যেসব শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে, সেগুলো বেমালুম ভুলিয়ে দিচ্ছিস। দেখ, আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

অর্থাৎ, তার দৃষ্টান্ত কুকুরের মত।

অন্য আয়াতে আছে—

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا -

অর্থাৎ, যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তারা তা পালন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত গাধার মত, যে রাশি রাশি কিতাবের বোঝা বহন করে।

কুকুর ও গাধার সমতুল্য হওয়ার চেয়ে বড় অপমান আর কি হবে? হাদীসে আছে, যার বিদ্যা বেশী এবং সুপথপ্রাপ্তি কম, সে আল্লাহ থেকে দূরেই চলে যায়। আরও আছে, আমলহীন আলেমকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তার অন্ত্রসমূহ বের হয়ে পড়বে এবং গাধা যেমন ঘানি ঘুরায়, তেমনি সে অগ্নিতে ঘুরবে। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ মূর্খের দুর্ভোগ একবার। সে লেখাপড়া করেনি। আল্লাহর মরযী হলে সে লেখাপড়া করত। কিন্তু বিদ্বানের দুর্ভোগ সাতবার। অর্থাৎ তার বিদ্যা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হবে এবং তাকে বলা হবে— বিদ্যা অর্জন করে তুমি কি আমল করেছ? আল্লাহর নেয়ামতের শোকর কিভাবে আদায় করেছ? রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন— কিয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাব সেই শিক্ষিত ব্যক্তির হবে, যার শিক্ষা তার কোন উপকারে আসেনি; অর্থাৎ, সে আমল করেনি। এ ধরনের আরও অসংখ্য রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এগুলো অসৎ বিদ্বান ব্যক্তির মরযীর অনুকূল নয়। তাই শয়তান এগুলো স্মরণ করায় না।

আরও একদল শিক্ষিত লোক আমল করে; কিন্তু কেবল বাহ্যিক এবাদত পালন করে এবং গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকে। তারা অন্তরের নিন্দনীয় দোষসমূহের প্রতি মোটেই নজর দেয় না। উদাহরণতঃ অহংকার, হিংসা, রিয়া, জাঁকজমকপ্রীতি, সুখ্যাতি অন্বেষণ ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকে না। কেউ কেউ তো এগুলোকে দোষ বলেও মনে করে না। তারা এসব হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, সামান্যতম রিয়াও শিরক। যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে যাবে না। হিংসা পুণ্য কাজকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন লাকড়ীকে খেয়ে ফেলে। এগুলো ছাড়াও মন্দ চরিত্রের অধ্যায়ে আরও অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এ শ্রেণীর শিক্ষিত লোক নিজের বাহ্যিক আকৃতি খুব সুন্দর করে, কিন্তু অন্তরের আকৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়। অথচ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাইরের আকৃতি ও অর্থ-সম্পদ দেখেন না; বরং অন্তর ও আমল দেখেন। অন্তরই মূল এবং মুক্তি এর নিরাপত্তার

উপরই নির্ভরশীল। আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

অর্থাৎ, কিন্তু যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ অন্তর নিয়ে।

এই প্রকার শিক্ষিতদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে মৃতদের কবর, যা বাহ্যত খুব সুসজ্জিত; কিন্তু অভ্যন্তরে গলিত লাশ অথবা অন্ধকার কক্ষ। গোনাহের মূল শিকড় হচ্ছে মন্দ স্বভাব, যা অন্তরের অভ্যন্তরে প্রোথিত। অন্তর থেকে এগুলো সাফ না করলে বাহ্যিক এবাদত দ্বারা কি ফল পাওয়া যাবে? উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির গায়ে খোস-পাঁচড়া দেখা দিল। চিকিৎসক তাকে মালিশ করার এবং পান করার ঔষধ বলে দিল, যাতে মালিশের ঔষধ দ্বারা ত্বকের উপকার হয় এবং সেবনের ঔষধ দ্বারা মূল শিকড় বিনষ্ট হয়। কিন্তু রোগী কেবল মালিশের ঔষধ লাগিয়েই ক্ষান্ত রইল এবং সেবনের ঔষধ ব্যবহার করল না; বরং এমন নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করল, যা দ্বারা খোস-পাঁচড়া আরও বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় এই রোগীর খোস-পাঁচড়া কোনদিন দূর হবে না যদি হাজারো বারও গায়ে ঔষধ মালিশ করে। কেননা, শিকড় তো ভিতরে অবস্থিত। সেটা দূর হলে এটাও দূর হবে।

আরেক দল শিক্ষিত লোক এসব অভ্যন্তরীণ দোষ সম্পর্কে জানে এবং এগুলো যে শরীয়তের দৃষ্টিতে বর্জনীয়, তাও জানে। কিন্তু তারা নিজেদেরকে যেহেতু বড় মনে করে, তাই মনে করে যে, এসব দোষ তাদের মধ্যে নেই। তাদের স্তর আল্লাহর কাছে এমন নয় যে, এসব বিষয় দ্বারা আল্লাহ তাদের পরীক্ষা নেবেন। এগুলো হল সাধারণ মানুষকে পরীক্ষা করার বিষয়– তাদের মত শিক্ষিতদেরকে নয়। এরপর যখন তাদের কাছ থেকে অহংকার, জাঁকজমক, আস্ফালন ও গর্বের চিহ্ন ফুটে উঠে, তখন বলে— এটা অহংকার নয়; বরং ধর্মের ইযযত রক্ষার স্পৃহা এবং বিদ্যার মহিমা প্রকাশ। কারণ, আমরা যদি নিকৃষ্ট পোশাক পরি এবং মজলিসে নিচে বসি, তবে ধর্মের শত্রুরা উপহাস করবে, এতে আমাদের অপমান তথা ধর্মের অপমান হবে। এই বিভ্রান্তরা জানে না যে, তাদের শত্রু তো বাস্তবে শয়তান, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করেছেন। শয়তান

তাদের কার্যকলাপ দেখে খুব হাস্য ও উপহাস করে। তারা একথাও জানে না যে, রসূলে করীম (সাঃ) ধর্মের মদদ কিভাবে করেছিলেন এবং কাফেরদেরকে কিভাবে পর্যুদস্ত করেছিলেন! তাঁর সাহাবীগণ কতটুকু বিনয় ও নম্রতার অধিকারী ছিলেন! দারিদ্র্য ও অসহায়তাকে কিভাবে অঙ্গের ভূষণ করে রেখেছিলেন। সিরিয়ায় হযরত উমর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে নিকৃষ্ট পোশাক পরিধানের আপত্তি উত্থাপন করা হলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা ইযযত দান করেছেন। অতএব, আমরা অন্য কোন বস্তুতে ইযযতের আকাঙ্ক্ষা করি না।

কখনও শিক্ষিত ব্যক্তি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গ্রন্থ রচনা করে। সে মনে করে আমি আল্লাহ তা'আলার শিক্ষা প্রচার করছি যাতে সাধারণ মানুষের উপকার হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য থাকে উৎকৃষ্ট রচনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নাম-যশ ও সুখ্যাতি অর্জন করা। এটা লক্ষ্য না হলে অন্য কোন ব্যক্তি যদি এ গ্রন্থ থেকে আসল গ্রন্থকারের নাম মিটিয়ে তদস্থলে নিজের নাম লিখে দেয়, তবে আসল গ্রন্থকার এটা অপছন্দ করে কেন? সে তো জানে যে, এই গ্রন্থ দ্বারা মানুষের যে উপকার হবে, তার সওয়াব সে-ই পাবে। আল্লাহর কাছেও সে-ই গ্রন্থকার– দাবীদার ব্যক্তি নয়।

আরেক দল শিক্ষিত লোক বেদআতীদের সাথে ঝগড়া-কলহে লিপ্ত থাকার জন্য কালাম শাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করে। তারা বিরোধী দলের আপত্তিসমূহ অন্বেষণ করার কাজে এবং তাদেরকে নিরুত্তর করার পদ্ধতি উদ্ভাবনের কাজে সর্বপ্রযত্নে নিয়োজিত থাকে। এ উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন উক্তি মুখস্থ করে নেয়। তাদের বিশ্বাস, মানুষের কোন আমল ঈমান ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। যে পর্যন্ত মানুষ আমাদের বিতর্ক না শিখে এবং কালাম শাস্ত্রের দলীলসমূহ না জানে, সে পর্যন্ত ঈমান শুদ্ধ হয় না। তারা আরও মনে করে, আল্লাহকে কেউ আমাদের চেয়ে বেশী চিনে না। যে আমাদের মাযহাবে বিশ্বাসী নয় এবং আমাদের শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, সে বেঈমান। এই প্রকার তর্কবিদ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত— এক শ্রেণী পথভ্রষ্ট এবং অপর শ্রেণী সত্যপন্থী। পথভ্রষ্ট তারা, যারা হাদীসের বিপরীত দিকে আহ্বান করে। আর সত্যপন্থী তারা, যারা হাদীস ও সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দেয়। কিন্তু বিভ্রান্তি উভয় শ্রেণীর মধ্যেই বিদ্যমান।

পথভ্রষ্ট দলের বিভ্রান্তি এই যে, তারা তাদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে গাফেল এবং এতেই নিজেদের মুক্তি মনে করে। এদের মধ্যেও অনেক দল আছে, যারা একে অপরকে কাফের বলে। সত্যপন্থী শ্রেণীর বিভ্রান্তি এই যে, তারা বিতর্ক ও মোনাযারাকে নেহায়েত জরুরী ও অত্যন্ত সওয়াবের কাজ মনে করে। তারা এ বিষয়ের প্রবক্তা যে, তাদের মত বিতর্ক ও তালাশ না করা পর্যন্ত কারও ধর্ম-পূর্ণতা লাভ করবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলকে বাহাস ও প্রমাণ ব্যতিরেকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, সে পূর্ণ ঈমানদার নয়। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা সমগ্র জীবন বিতর্কানুষ্ঠান, চিত্তাকর্ষক বাক্যাবলী আয়ত্তকরণ এবং বেদআতীদের আপত্তি খণ্ডনে অতিবাহিত করে দেয় এবং নিজের অন্তরের কোন খোঁজ-খবর নেয় না। ফলে বাহ্যিক গোনাহ ও অভ্যন্তরীণ ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পায় না। তাদের যদি অন্তর্দৃষ্টি থাকত, তবে অবশ্যই ইসলামের প্রাথমিক যুগের অবস্থা দেখতে পেত, যে যুগ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তারা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তারা অনেক বেদআতী ও প্রবৃত্তির পূজারী দেখেছেন; কিন্তু আপন জীবন ও ধর্মকে বিতর্কবাণের লক্ষ্যস্থল করেননি; বরং কখনও এ সম্পর্কে আলোচনা পর্যন্ত করেননি। নেহায়েত প্রয়োজন দেখা দিলে সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ীই কথা বলেছেন, যাতে পথভ্রষ্ট ব্যক্তি তার পথভ্রষ্টতা জেনে যায়। তারা যখন কোন গোমরাহকে তার গোমরাহীতে পীড়াপীড়ি করতে দেখেছেন, তখন তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন এবং আল্লাহর ওয়াস্তে তার সাথে শত্রুতা রেখেছেন— জীবনভর কথা কাটাকাটি করেননি।

পূর্ববর্তী মনীষীরা বলেছেন— সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দেয়া সুন্নত এবং দাওয়াতের মধ্যে বিতর্কে প্রবৃত্ত না হওয়াও সুন্নত। আবূ ওসামা বাহেলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যে জাতিকে হেদায়াত দান করা হয়, তারা পথভ্রষ্ট হয় না যে পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে না উঠে। একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের এক সমাবেশে এসে দেখলেন, তারা পরস্পর তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত রয়েছেন। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ক্রোধের আতিশয্যে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ

ধারণ করল। তিনি বললেন ঃ

اَبِهٰذَا بُعِثْتُمْ اَمِرْتُمْ اَنْ تَضْرِبُوْا كِتَابَ اللّٰهِ بَعْضَهٗ بِبَعْضٍ انْظُرُوْا اِلٰى مَا اُمِرْتُمْ بِهٖ فَاعْمَلُوْا اَوْ مَا نُهِيْتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

অর্থাৎ, তোমরা কি এ জন্যেই প্রেরিত হয়েছ? তোমরা আদিষ্ট হয়েছ যে, আল্লাহর কিতাবের কতক অংশকে কতক অংশের দ্বারা প্রহার কর? দেখ, তোমরা যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা কর আর যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা থেকে বিরত হও।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) সকল ধর্মাবলম্বীর প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিতর্ক সভায় বসেননি তাদেরকে অভিযুক্ত করার জন্যে অথবা নিশ্চুপ করার জন্যে অথবা কোন আপত্তির জওয়াব দেয়ার জন্যে অথবা নিজের পক্ষ থেকে আপত্তি করার জন্যে। তিনি কেবল কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে তাদের সাথে বিতর্ক করেছেন, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। এর বেশী বাহাস করেননি। কেননা, বেশী কথাবার্তার কারণে তাদের অন্তর বিক্ষিপ্ত হত এবং নানা রকমের আপত্তি ও সন্দেহ দেখা দিত, যা অন্তর থেকে মুছত না। আল্লাহ না করুন, তিনি তাদের সাথে বিতর্ক করতে অক্ষম ছিলেন না। বরং বিজ্ঞ ও সাবধানী ব্যক্তিমাত্রই বিতর্ককে পছন্দ করে না। সুতরাং আমাদের ততটুকু বিতর্কই করা উচিত, যতটুকু সাহাবায়ে কেরাম ইহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে করেছেন। তাঁরা সমগ্র জীবন এসব বিতর্কে ব্যয় করে দেননি। এছাড়া যে বিষয়ে আমাদের পক্ষ থেকে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, তাতে আমরা এতটুকু মনোনিবেশ করব কেন? কোন বেদআতীর সাথে বিতর্ক করলে দেখা যায় যে, সে বিতর্কের ফলস্বরূপ বেদআত পরিত্যাগ করে না; বরং বিদ্বেষবশত তার বেদআত আরও বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় এসব বিরুদ্ধবাদীর সাথে বিতর্ক করার তুলনায় আত্মসংশোধনে জোর দেয়াই উত্তম। এটা তখন, যখন ধরে নেয়া যায় যে, আমাদেরকে বিতর্ক করতে নিষেধ করা হয়নি। কিন্তু যেখানে নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান আছে, সেখানে কাউকে বিতর্কের মাধ্যমে সুন্নতের দিকে দাওয়াত দেয়া যেন এক

সুন্নত বর্জন করে অন্য সুন্নত পালন করার নামান্তর।

আরেক দল শিক্ষিত লোক ওয়ায-নসীহতে ব্যস্ত থাকে। তাদের মধ্যে উচ্চমর্যাদাশীল তারা, যারা অন্তরের গুণাবলী অর্থাৎ, খোদাভীতি, আশা, সবর, শোকর, তাওয়াক্কুল, সংসারের প্রতি অনাসক্তি, বিশ্বাস, আন্তরিকতা, সততা ইত্যাদি বিষয়বস্তু মানুষকে শুনায়। তারা এই বিভ্রান্তিতে লিপ্ত যে, তারা যেহেতু এসব গুণ বর্ণনা করে, তাই তারা নিজেরা প্রথমে এসব গুণে গুণান্বিত। অথচ আল্লাহর কাছে তারা এসব গুণে গুণান্বিত নয়। যদি অল্প বিস্তর কিছু গুণ তাদের মধ্যে থাকেও, তবে প্রতিটি সাধারণ মুসলমানের মধ্যেও কিছু না কিছু থাকে। সুতরাং তার ফযীলত কোথায়? তারা যখন এখলাসের গুণ বর্ণনা করে, তখন বর্ণনার মধ্যেও এখলাস করে না। যখন রিয়ার উল্লেখ করে, তখন তারাও রিয়ামুক্ত হয় না। সংসার অনাসক্তির বর্ণনাও এজন্যে করে যে, তারা নিজেরা সংসারের প্রতি গভীর আসক্ত। মোটকথা, তারা বাহ্যত মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে। কিন্তু নিজেরা আল্লাহ থেকে পলায়ন করে। অপরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে; কিন্তু নিজেরা দূরে সরে যায়। এ অবস্থা হচ্ছে সেসব ওয়াযকারীর, যাদের ওয়ায নিষ্কলঙ্ক এবং বর্ণনা নির্ভুল অর্থাৎ, যারা কোরআন-হাদীস ও হযরত হাসান বসরী (রহঃ) প্রমুখের তরীকা অনুযায়ী ওয়ায করে।

কিন্তু আরেক শ্রেণীর ওয়াযকারী ওয়াযের অপরিহার্য নিয়ম-পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত। আজকালকার সকল ওয়াযকারীই এমনি ধরনের। আল্লাহ রক্ষা করেছেন, এমন বিরল কেউ থাকতে পারে। কিন্তু আমি এমন কাউকে জানি না। এ ধরনের ওয়ায়েয মানুষকে নতুন কথা শুনানোর জন্যে অনেক মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বিবেক ও আইন বহির্ভূত কথাবার্তা বর্ণনা করে। কেউ কেউ সাজানো-গুছানো ও ছন্দময় বাক্য ব্যবহার করে এবং প্রমাণস্বরূপ বিরহ ও মিলনের কবিতা আবৃত্তি করে, যাতে মানুষ ভাবাতিশয্যে চীৎকার করে উঠে। এরা মানুষরূপী শয়তান। নিজেরাও গোমরাহ এবং অপরকেও গোমরাহ করে। আরেক দল ওয়ায়েয দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গদের উক্তি হুবহু মুখস্থ করে নেয় এবং এসব উক্তির সঠিক অর্থ না বুঝে মজলিসে বর্ণনা করে। আর মনে করে যে, আল্লাহ থেকে আত্মরক্ষা না করলেও আল্লাহর মাগফেরাত তাদের সাথে রয়েছে।

মোটকথা, এই শেষ যুগে শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিভ্রান্তি গণনার বাইরে। নমুনাস্বরূপ এখানে কয়েকটি বিভ্রান্তি উল্লেখ করা হল।

(২) সংসারত্যাগী ও এবাদতকারীদের বিভ্রান্তি ঃ এরাও কয়েকটি দলে বিভক্ত । কারও নামাযে, কারও তেলাওয়াতে, কারও হজ্জে, কারও জেহাদে এবং কারও সংসার অনাসক্তিতে বিভ্রান্তি হয়। তবে বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও বিভ্রান্ত হয় না। এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। এদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক ফরয ছেড়ে নফল ও মোস্তাহাব নিয়ে ব্যস্ত থাকে। উদাহরণতঃ কেউ উযু করতে গেলে নানা ধরনের সন্দেহ-সংশয়বশত সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে। এমনকি, যে পানি শরীয়তের দৃষ্টিতে পাক, তাতেও তাদের খটকা থাকে এবং নাপাকীর দূরবর্তী সম্ভাবনাকেও তারা নিকটবর্তী মনে করতে থাকে। অথচ হালাল ভক্ষণের ক্ষেত্রে তারাই নিকটবর্তী সম্ভাবনাকে দূরবর্তী জ্ঞান করে। বরং মাঝে মাঝে অকৃত্রিম হারামও খেয়ে ফেলে। যদি তারা পানির সাবধানতাকে খাওয়ার মধ্যে ব্যবহার করত, তবে এটা সাহাবায়ে কেরামের জীবনধারার অনুরূপ হত। হযরত উমর (রাঃ) একবার জনৈক খৃস্টান মহিলার ঘটি থেকে পানি নিয়ে উযু করে নেন; অথচ নাপাকীর সম্ভাবনা প্রকট ছিল। কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর এতদূর সাবধানতা ছিল যে, অনেক হালাল বস্তুও হারামে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে বর্জন করতেন। এই বিভ্রান্তদের কেউ কেউ উযু-গোসলে পানির অপচয় করে; অথচ এব্যাপারে অকাট্য নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত রয়েছে। কেউ কেউ এতই সন্দেহপ্রবণ যে, উযু করতে করতে জামাআত খতম হয়ে যায় অথবা নামাযের সময়ই চলে যায়। সময় থাকলেও তারা ভ্রান্ত, এতে কোন সন্দেহ নেই।

আসলে শয়তান মানুষকে খুব উত্তম পন্থায় এবাদত থেকে বিরত রাখে। এধরনের ধারণা সৃষ্টি করে যে, মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কোন কোন এবাদতকারীর উপর নামাযের নিয়ত করার সময় সন্দেহ প্রবল হয়ে যায়। শয়তান তাদেরকে নিয়ত ঠিক করে নেয়ার সময় দেয় না; বরং এত পেরেশান করে যে, হয় জামাআত খতম হয়ে যায়, না হয় নামাযের সময় চলে যায়। যদি তারা তাকবীর বলে তাহরীমা বেঁধে নেয়, তবে নামাযের বিশুদ্ধতায় সন্দেহ পোষণ করতে থাকে। কখনও "আল্লাহু

আকবার” বলার মধ্যে এত সন্দেহ করে যে, সাবধানতার আতিশয্যে তাকবীরের শব্দ বদলে যায়। নামাযের শুরুতে এ অবস্থা হয়, এরপর সমগ্র নামাযে গাফেল থাকে এবং মনকে উপস্থিত করে না। তারা বিভ্রান্তির কারণে মনে করে যে, এসব কাণ্ড আল্লাহর কাছে খুব প্রিয়। কতক লোকের উপর "আলহামদু" ও অন্যান্য সকল ওযীফার মাখরাজসহ বিশুদ্ধ উচ্চারণের সন্দেহ প্রবল থাকে। তারা সর্বদাই এ ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করে এবং একেই অত্যাবশ্যক মনে করে অন্যান্য বিষয়ে চিন্তাই করে না। তারা আয়াতের অর্থ, তার উপদেশ ও রহস্য হৃদয়ঙ্গম করার সাথে কোন সম্পর্কই রাখে না। এটা বড় বিভ্রান্তি। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এমনভাবে কোরআন তেলাওয়াত করার আদেশ দিয়েছেন, যেমন তারা দৈনন্দিন কথাবার্তা বলে। অতএব, এতে এহেন বানোয়াট কোত্থেকে এল? তাদের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন ব্যক্তিকে একটি বার্তা বাদশাহের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রেরণ করা হল। সে বাদশাহের দরবারে পৌঁছে বার্তার শব্দসমূহের সঠিক উচ্চারণে সমগ্র মনোযোগ নিবিষ্ট করল এবং এক এক শব্দকে ঠিক করতে গিয়ে কয়েকবার উচ্চারণ করল। কিন্তু বার্তার বিষয়বস্তু কি ছিল এবং বাদশাহের দরবারের শিষ্টাচার কি কি ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করল না। এরূপ ব্যক্তির শাস্তি পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয়া ছাড়া আর কি হতে পারে?

এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক ঘাস কাটার ন্যায় কোরআন পাঠ করে। তারা মাঝে মাঝে একদিনে এক খতম করে। তারা মুখে কোরআন পাঠ করে; কিন্তু অন্তরে নানা প্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষা বিচরণ করতে থাকে। অর্থের দিকে তো কোন মনোযোগই থাকে না যে শাস্তিবাণী ও উপদেশবাণী দ্বারা অন্তর কিছুটা প্রভাবিত হবে।

একদল লোক রোযা রাখার জন্যে পাগল থাকে। তারা সর্বদা অথবা পবিত্র দিনগুলোতে রোযা রাখে। কিন্তু নিজের জিহ্বাকে গীবত থেকে, অন্তরকে রিয়া থেকে, পেটকে হারাম থেকে এবং কথাবার্তাকে বাজে বিষয়াদি থেকে বাঁচিয়ে রাখে না। সারাদিন অনর্থক বকবক করতে থাকে। এতদসত্ত্বেও নিজেকে উত্তম মনে করে। যা ফরয তা করে না এবং নফল

নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাও আবার যেমন করা উচিত, তেমন করে না। এটা প্রকাশ্য ধোকা।

কিছু লোক হজ্জকর্মে বিভ্রান্ত। তারা অপরের হক ও ঋণ আদায় না করে, পিতামাতার অনুমতি ছাড়াই এবং হালাল পাথেয় সঙ্গে না নিয়েই হজ্জ করতে বের হয়ে পড়ে। পথিমধ্যে নামায ও অন্যান্য ফরয কর্ম বিনষ্ট করে এবং অশ্লীলতা ও কলহ-বিবাদ থেকে বিরত থাকে না। এরপর যখন বাড়ী ফিরে আসে, তখন অন্তরে কুচরিত্রতা ও বদস্বভাবের ভাণ্ডার থাকে। এতদসত্ত্বেও তারা হজ্জ করাকে উত্তম মনে করে।

(৩) সূফীগণের বিভ্রান্তি ঃ সূফীগণের মধ্যেও অনেক শ্রেণী রয়েছে। তাদের উপর বিভ্রান্তি প্রবল থাকে। এক শ্রেণীর সূফীর রীতি এই যে, তারা সাচ্চা সূফীগণের ন্যায় পোশাক, আকার-আকৃতি, ভাষা, আদব-কায়দা, রীতিনীতি ও পরিভাষা তৈরি করে এবং বাহ্যিক দিক দিয়ে তাদের অনুরূপ হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ তারা রাগরাগিণী শ্রবণ করে, ভাবাতিশয্যে নর্তন-কুর্দন করে, জায়নামাযে মাথানত করে চিন্তাশীলদের ন্যায় বসে, দীর্ঘশ্বাস নেয় এবং ক্ষীণস্বরে কথা বলে। এতেই তারা বিভ্রান্তিবশত মনে করে যে, সূফী হয়ে গেছে। অথচ তারা নিজেদেরকে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনায় অভ্যস্ত করে না এবং অন্তরকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গোনাহ থেকে পবিত্র করে না, যা সাচ্চা সূফীগণের মধ্যে মামুলী বিষয় বলে পরিগণিত হয়। কেউ এসব বিষয় আয়ত্ত করে নিলেও নিজেকে সূফী বলে গণ্য করতে পারে না এবং বড় বড় কথা বলতে পারে না। এমতাবস্থায় যারা হারাম ও সন্দেহযুক্ত ধন-সম্পদের বাছ-বিচার করে না, টাকা-পয়সা দেখলেই লাফিয়ে পড়ে, সামান্য বিষয়ে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে এবং কেউ সামান্য বিপরীত কথা বললেই তার মানহানি করতে উদ্যত হয়, তারা কিরূপে সূফী হতে পারে? কিয়ামতের দিন যখন এই মেকী সূফীর দল আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, যিনি বাহ্যিক ছেড়াবাস নয়; বরং অন্তরের অবস্থা দেখেন, তখন তাদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না।

আরেক শ্রেণীর সূফীর আবার যেনতেন পোশাক পরতে রুচিতে বাধে; কিন্তু সূফী হওয়ার বাসনাও প্রবল। সূফীগণের পোশাক ছাড়া যেহেতু সূফী

হওয়া যায় না, তাই তারা উৎকৃষ্ট বস্ত্রের খন্ড খন্ড জোড়া দিয়ে বিচিত্র ধরনের পোশাক তৈরি করে, যা রেশমী বস্ত্রের চেয়েও মূল্যবান বেশী। তারা মনে করে যে, পোশাকে তালি লাগিয়েই তারা সূফী হয়ে গেছে। পূর্ববর্তী সূফীগণ তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করতেন। তাই তারাও উৎকৃষ্ট বস্ত্রকে টুকরা টুকরা করে তালির মত করে নেয়। অথচ এটা বুঝা কঠিন যে, মূল্যবান বস্ত্রকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে সেলাই করে নিয়েই তারা পূর্ববর্তী সূফীগণের অনুরূপ হয়ে গেল কিরূপে? বলা বাহুল্য, তাদের এই খামখেয়ালী সকল বিভ্রান্তিকে ছাড়িয়ে গেছে। কেননা, তারা উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পোশাক পরিধান করে, সুস্বাদু খাবার খায়, যালেম ও পাপাসক্তদের অর্থ দু'হাতে গ্রহণ করে এবং বাহ্যিক গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকে না; আন্তরিক গোনাহের কথা নাই বা বলা হল। এরপরও তারা সূফী বলে থাকে এবং নিজেদেরকে উত্তম মনে করতে থাকে। তাদের অনিষ্ট সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। কেননা, যারা তাদের অনুসরণ করে, তারা তাদের মতই বরবাদ হয়ে যায়। আর যারা অনুসরণ করে না, তাদের বিশ্বাস সূফী সম্প্রদায়ের প্রতিই শিথিল হয়ে যায়। সকলকেই তারা এরূপ মনে করে। ফলে, সত্যিকার সূফীগণ সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করতে তারা দ্বিধা করে না। বলা বাহুল্য, এটা এই তথাকথিত সূফীদের কুকর্মেরই ফল।

আরেক শ্রেণীর সূফী মারেফত জ্ঞানের দাবী করে। তারা বলে, আমরা সকল মকাম ও হাল অতিক্রম করেছি, সর্বদা হকের মোশাহাদা করি এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছি। অথচ তারা কেবল এসব বিষয়ের নাম ও শব্দই শুনেছে—এগুলোর স্বরূপ, শর্ত, আলামত ও বাধাবিপত্তি সম্পর্কে কিছুই জানে না। তারা মারেফতওয়ালাদের কিছু বিপরীতধর্মী কথাবার্তা শিখে নেয় এবং সেগুলোই গেয়ে ফিরে। তাদের মতে এগুলো অত্যধিক উচ্চস্তরের কথা। ফলে, তারা আবেদ ও আলেমদেরকে মোটেই যোগ্য মনে করে না। আবেদদের সম্পর্কে বলে, এরা পরিশ্রমী শ্রমিক। আর আলেমদের সম্পর্কে বলে, এরা আল্লাহ থেকে আড়ালে। অথচ আল্লাহ তা'আলার কাছে এই ধরনের সূফীরাই মুনাফিক, বদকার, নির্বোধ ও মূর্খ। এরা না শিক্ষা গ্রহণ করে, না চরিত্র সংশোধন করে এবং না অন্তরের হেফাযত করে।

কেউ কেউ বলে, বাহ্যিক আমল ধর্তব্য নয়। আল্লাহ তা'আলা অন্তরকে দেখেন। আমাদের অন্তর আল্লাহর মহব্বতে পাগলপারা। দুনিয়াতে আমরা দেহের পিঞ্জরে আবদ্ধ আর অন্তর অসীমের আস্তানা প্রদক্ষিণরত। আমরা সর্বসাধারণের স্তর থেকে অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেছি। সুতরাং দৈহিক আমল দ্বারা আত্মসংশোধনের প্রয়োজন নেই। যেহেতু আমরা মারেফতে শক্তিশালী, তাই কামনা ও খায়েশ আমাদেরকে আধ্যাত্মপথে বাধা দিতে পারে না। তাদের এসব কথাবার্তা থেকে বুঝা যায় যে, তারা পয়গম্বরগণের স্তরও অতিক্রম করে গেছে।

কতক সূফী দাবী করে যে, তারা আল্লাহর আশেক ও তাঁর মহব্বতের জালে আটকা পড়েছে। সম্ভবত তারা আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব ধারণা পোষণ করে, যেগুলো বেদআত অথবা কুফর হওয়া বিচিত্র নয়। তারা মারেফতের পূর্বেই মহব্বতের দাবী করে। অথচ কতক কাজ এমন করে, যা আল্লাহর পছন্দনীয় নয়। যেমন আল্লাহর কাজের উপর নিজের খাহেশকে অগ্রাধিকার দেয়া, লোকলজ্জার কারণে কোন কোন কাজ না করা ইত্যাদি। এগুলো যে মহব্বতের পরিপন্থী, সেকথা তারা জানেই না। কতক লোক আহার, পোশাক ও বাসস্থানের বেলায় হালাল তালাশ করে না, অন্যান্য ক্ষেত্রে হালালের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। তারা জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি না কেবল হালাল অন্নের জন্যে সন্তুষ্ট হবেন এবং না কেবল সকল আমল করে হালাল অন্ন না খাওয়ার জন্যে সন্তুষ্ট হবেন; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে হালাল অন্ন খাওয়াসহ সকল এবাদত পালন করা জরুরী এবং সকল গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। যে মনে করে, সামান্য বিষয় দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হবে, সে বিভ্রান্ত।

আধ্যাত্ম পথ অতিক্রম করার ব্যাপারে যত প্রকার বিভ্রান্তি হতে পারে, সেগুলো পুরোপুরি বর্ণনা করার জন্যে বিরাট পুস্তক দরকার। এলমে মোকাশাফার বিশদ বর্ণনা ছাড়া সবগুলো বিভ্রান্তি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। অথচ এলমে মোকাশাফা বর্ণনা করার অনুমতি নেই।

(৪) বিত্তশালীদের বিভ্রান্তি ঃ একদল বিত্তশালী লোক মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা, পুল ইত্যাদি দর্শনীয় কীর্তি নির্মাণে তৎপর থাকে। তারা এগুলোর মধ্যে নিজেদের নাম খোদাই করে লিখে দেয়, যাতে মৃত্যুর

পরও তাদের স্মৃতি অম্লান থাকে। এ কাজ করার পর তারা মনে করে এর মাধ্যমে তারা মাগফেরাতের উপযুক্ত হয়ে গেছে। অথচ দু'কারণে তারা বিভ্রান্ত। এক, তারা যুলুম, ঘুষ, সূদ ইত্যাদি অবৈধ উপায়ে অর্জিত টাকা-পয়সা দ্বারা এসব তৈরি করে। সুতরাং হারাম ভক্ষণের কারণে তারা শাস্তির যোগ্য। দুই, তারা রিয়া ও সুখ্যাতির জন্যে অর্থ ব্যয় করে। তাদের উচিত ছিল এই অর্থ উপার্জন না করা। উপার্জন করে যখন তারা গোনাহগার হল, তখন তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া এবং যে অর্থ প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেয়া দরকার ছিল, মালিক পাওয়া না গেলে তার ওয়ারিসকে, ওয়ারিস না থাকলে মুসলমানদের জরুরী প্রয়োজনে ব্যয় করা দরকার ছিল। এ ব্যাপারে মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করাই অধিক জরুরী মনে হয়। কিন্তু তারা মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে না; বরং সুখ্যাতি কুড়ানোর জন্যে দালান-কোঠা নির্মাণে তৎপর হয়ে যায়। সুতরাং জনকল্যাণ তাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং রিয়া, সুখ্যাতি এবং প্রশংসা কুড়ানোই তাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাদেরকে যদি বলা হয় যে, দালান-কোঠা তৈরি কর, কিন্তু তাতে নিজের নাম খোদাই করো না, তবে কখনও তা মেনে নেবে না এবং দালান-কোঠা নির্মাণে সম্মত হবে না। যদি মানুষকে দেখানো উদ্দেশ্য না হত এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই হত, তবে নাম খোদাই করার কি প্রয়োজন ছিল?

আরেক দল ধনী লোক হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জন করে মসজিদে ব্যয় করে দেয়। অথচ তার আশেপাশে কিংবা শহরে এমন দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোক বাস করে, যাদেরকে দেয়া মসজিদে দেয়ার চেয়ে শরীয়তের দৃষ্টিতে অনেক ভাল। কিন্তু তারা মসজিদেই দেয়। কারণ, এতে মানুষের মধ্যে সুখ্যাতি হয়। এধরনের বিত্তশালী দাতা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্ত। এছাড়া মসজিদে চিত্রাংকন ও কারুকার্য করা নিষিদ্ধ। নামাযীদের ধ্যান সেদিকে বিভক্ত হয়। দৃষ্টি সেদিকেই পড়ে। অথচ নামাযের উদ্দেশ্য অনুনয়-বিনয় ও অন্তরের উপস্থিতি। অন্তর কারুকার্যে মশগুল থাকলে সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে এবং এর শাস্তি যে কারুকার্য করে, তার উপর বর্তাবে। অথচ সে ধারণা করে থাকে যে, সৎকাজ করেছে, যা ওসীলা হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির। কিন্তু বাস্তবে সে আল্লাহর ক্রোধের যোগ্য হবে।

একবার হযরত ঈসা (আঃ)-এর শিষ্যগণ তাঁর খেদমতে আরয করল ঃ দেখুন, এই মসজিদটি কি চমৎকার! তিনি বললেন ঃ হে আমার উম্মত, আমি সত্য বলছি, আল্লাহ তা'আলা এই মসজিদের ইটের উপর ইট কায়েম রাখবেন না। এই মসজিদ নির্মাণকারীদের গোনাহের কারণে সকলকে বরবাদ করে দেবেন। আল্লাহর কাছে না সোনা-রূপার মূল্য আছে, না এসব ইটের, যেগুলোকে তোমরা চমৎকার বলছ। বরং তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় হচ্ছে সৎ অন্তর, যা দিয়ে তিনি পৃথিবীকে আবাদ রাখেন। যখন সৎ অন্তর থাকবে না, তখন পৃথিবীকে শ্মশানে পরিণত করে দেবেন।

হযরত আবু দারদার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন তোমরা মসজিদকে চাকচিক্যময় করবে এবং কোরআনকে সোনা-রূপা পরিধান করাবে, তখন তোমাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসবে। হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনায় মসজিদে নববী নির্মাণ করার ইচ্ছা করেন, তখন হযরত জিবরাঈল এসে বললেন ঃ সাত হাত উঁচু করবেন এবং কারুকার্য ও চিত্রাংকন করবেন না। মোটকথা, এই ধনীরা একটি মন্দ কাজকে ভাল মনে করে এবং তারই উপর ভরসা করে। এটা তাদের বিভ্রান্তি।

আরেক দল ধনী টাকা-পয়সা ব্যয় করে এবং ফকীর-মিসকীনকে দান করে। কিন্তু এই দানের জন্যে এমন জায়গা তালাশ করে, যেখানে অধিক পরিমাণে লোক উপস্থিত থাকে। এছাড়া এমন ফকীর খোঁজে, যে কৃতজ্ঞ হয় এবং জনসমক্ষে দাতার স্তুতি কীর্তন করে। তারা গোপনে দান করাকে ভাল মনে করে না। কোন ফকীর তাদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে গোপন করলে তাকে তারা অপরাধী ও অকৃতজ্ঞ মনে করে। তারা কখনও হজ্জের পর হজ্জ করে; কিন্তু দরিদ্র প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রাখে। একারণেই হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ শেষ যুগে এমন লোক হবে, যারা বিনা কারণেও হজ্জ করবে। ধনী হওয়ার কারণে তারা সফরকে কষ্টকর মনে করবে না। তারা বঞ্চিত অবস্থায় গৃহে ফিরবে। অর্থাৎ, সওয়াব কিছুই পাবে না। নিজেরা তো আরামদায়ক যানবাহনে বসে সফর করবে, প্রতিবেশীর খবরও নেবে না।

আবূ নছর (রহঃ) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি হযরত বিশর ইবনে হারেছের

কাছে বসে বলল ঃ আমি হজ্জ করার ইচ্ছা করে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হজ্জের জন্যে তোমার কাছে কি পরিমাণ অর্থ আছে? সে জওয়াব দিল ঃ দু'হাজার দেরহাম। বিশর জিজ্ঞেস করলেন ঃ হজ্জের দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কি— দেশভ্রমণ, কাবাগৃহের আগ্রহ, না আল্লাহর সন্তুষ্টি? লোকটি আরয করল ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি। তিনি বললেন ঃ যদি গৃহে বসে এ দু'হাজার দেরহাম ব্যয় করে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি পেয়ে যাও এবং সন্তুষ্টিপ্রাপ্তির ব্যাপারে তোমার দৃঢ় বিশ্বাসও অর্জিত হয়ে যায়, তবে তুমি কি করবে? লোকটি বলল ঃ তবে এভাবেই সন্তুষ্টি অর্জন করব। তিনি বললেন ঃ তাহলে যাও, এই দেরহামগুলো দশ প্রকার ব্যক্তিকে দিয়ে দাও— ঋণগ্রস্তকে দাও, যে তার ঋণ পরিশোধ করবে, অভাবগ্রস্তকে দাও, যে তার অভাব মোচন করবে, বাল-বাচ্চাদারকে দাও, যে তার বাল-বাচ্চাদেরকে পালন করবে, অনাথ শিশুদের দেখাশোনাকারীকে দাও, যে তাদেরকে খুশী করবে। যদি মনে চায়, তবে এসব প্রকারের এক এক ব্যক্তিকে দাও। আমার এরূপ বলার কারণ এই যে, কোন মুসলমানের মন খুশী করা, মযলুমের ডাকে সাড়া দেয়া এবং দুর্বলের সাহায্য করা ফরয হজ্জের পর একশ' হজ্জের চেয়েও উত্তম। কাজেই এখন যাও এবং আমি যা বললাম– তাই কর। নতুবা মনের কথা বলে দাও। লোকটি বলল ঃ আমার মন তো ভ্রমণ করতেই ইচ্ছুক। অগত্যা হযরত বিশর মুচকি হেসে বললেনঃ যখন টাকা-পয়সা ব্যবসা-বাণিজ্য ও সন্দেহযুক্ত পথে সঞ্চিত হয়ে যায়, তখন মন চায় কোন সৎকর্ম সম্পাদন করতে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কসম করেছেন যে, তিনি মুত্তাকীদের আমল ছাড়া কারও আমল কবুল করবেন না।

আরেক দল লোক কৃপণতাবশত অর্থকড়ি সঞ্চয় করে এবং সৎকর্ম ও এবাদত এমন করে, যাতে মোটেই অর্থ ব্যয় করতে হয় না। যেমন দিনের বেলায় রোযা রাখে এবং রাত্রিতে জাগরণ করে কিংবা কোরআন খতম করে, এরাও বিভ্রান্ত। কেননা, মারাত্মক কৃপণতা তাদের অন্তরকে ঘিরে রেখেছে। অর্থ ব্যয় করে প্রথমে এরই মূলোৎপাটন করা উচিত ছিল। এর পরিবর্তে যা তারা করে, তার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাদের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কারও পরনের কাপড়ে সাপ ঢুকে গেছে। ফলে, সে মৃত্যুর

মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। কিন্তু এ দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে সর্দির ঔষধ প্রস্তুত করার কাজে ব্যস্ত। বল, যাকে সাপে দংশন করবে, সর্দির ঔষধ দ্বারা তার কি উপকার হবে? এ কারণেই হযরত বিশরের কাছে কেউ বলেন ঃ অমুক ধনী ব্যক্তি নামায, রোযা খুব করে। তিনি বললেন ঃ তার অবস্থার সাথে যে কাজের মিল ছিল, তা তো সে ছেড়ে দিয়েছে এবং যে কাজ অন্যের জন্যে উপযুক্ত ছিল, তা অবলম্বন করেছে। তার কর্তব্য ছিল নিরন্নকে অন্ন দেয়া এবং ফকীর-মিসকীনকে খয়রাত দেয়া। নিজে ক্ষুধার্ত থাকার চেয়ে দান-খয়রাত তার জন্যে উত্তম ছিল।

আরেক দল ধনী এত বেশী কৃপণ যে, ধন-সম্পদের মধ্য থেকে যাকাত ছাড়া অন্য কিছু দান করে না। যাকাতেও এমন নিকৃষ্ট মাল দেয়, যা নিজের কাছে রাখতে ঘৃণা করে। তারা যাকাত দিতে গিয়ে এমন ফকীর বেছে নেয়, যে তাদের খেদমত করে অথবা ভবিষ্যতে যার কাছ থেকে খেদমত আশা করে কিংবা যে কোন বড় লোকের সুপারিশ নিয়ে আসে। তাকে দান করার উদ্দেশ্য থাকে সেই বড় লোকের প্রিয়ভাজন হওয়া। এসব বিষয় নিঃসন্দেহে খারাপ নিয়তের পরিচায়ক। যারা এরূপ করে, তারা বিভ্রান্ত। কারণ, এরূপ করেও তারা নিজেদেরকে আল্লাহর ফরমাবরদার বলে ধারণা করে; অথচ তারা বদকার, গোনাহগার। আল্লাহর এবাদত করে অপরের কাছে বিনিময় চায়।

এগুলো ছাড়া বিত্তশালীদের মধ্যে আরও অসংখ্য বিভ্রান্তি দেখা যায়। নমুনা স্বরূপ এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হল। আরও একদল লোক আছে, যারা কেবল বিত্তশালীদের মধ্যেই নয়; বরং জনসাধারণের এমনকি ফকীরদের মধ্যেও বিস্তৃত। তারা ওয়াযের মজলিসে উপস্থিত থাকাকেই মুক্তির জন্যে যথেষ্ট মনে করে। ওয়াযের মজলিসে যাওয়াকে তারা একটি প্রথা ও অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। তাদের বিশ্বাস, ওয়ায শুনলেই সওয়াব পাওয়া যাবে এবং তদনুযায়ী আমল করা জরুরী নয়। এটা তাদের খামখেয়ালী। কেননা, ওয়ায মাহফিলের মাহাত্ম্য এ কারণেই যে, এর মাধ্যমে সৎকর্মের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এই আগ্রহ এ কারণেই ভাল যে, এতে মানুষ আমল করতে উদ্বুদ্ধ হয়। যদি ওয়ায দ্বারা দুর্বল আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যা আমলে উদ্বুদ্ধ করে না, তবে এরূপ ওয়াযের কোন উপকারিতা নেই। এ

ধরনের শ্রোতা যখন ওয়ায়েযের মুখে ওয়ায মাহফিলের ফযীলত এবং কান্নাকাটি করার সওয়াব শুনে, তখন নারীদের ন্যায় কান্না শুরু করে দেয়। আবার কোন সময় কোন ভয়ংকর কথা শুনে হাতের উপর হাত মেরে হায় আল্লাহ! মায়াযাল্লাহ! সোবহানাল্লাহ! ইত্যাদি বলা ছাড়া আর কিছুই করে না। তাদের ধারণা, তারা যা কিছু করে সবই ভাল। অথচ এটা প্রকাশ্য বিভ্রান্তি। তাদের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন রোগী ব্যক্তি ঔষধালয়ে যাতায়াত করে এবং সেখানে ঔষধের গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা শোনে অথবা কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি এমন মজলিসে যায়— যেখানে সুস্বাদু খাদ্যের আলোচনা হয়। বলা বাহুল্য, এতে না রোগীর রোগ দূর হবে, না ক্ষুধাতুরের ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে। এমনিভাবে ওয়ায-মাহফিলে এবাদত ও সৎকর্মের বর্ণনা শুনলে এবং আমল না করলে আল্লাহর কাছে কোন উপকার পাওয়া যাবে না।

এখন প্রশ্ন হয় যে, উপরে যে সকল বিভ্রান্তি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো থেকে কেউই মুক্ত নয় এবং এ সকল বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষা করাও অসম্ভব। সুতরাং বিভ্রান্তির এ বর্ণনা থেকে মানুষের মধ্যে এক প্রকার নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়, যার ফলস্বরূপ সে আমল করতে উৎসাহ পায় না এবং হাত গুটিয়ে বসে থাকে। এর জওয়াব এই যে, মানুষ যখন সাহস হারিয়ে ফেলে, তখন সে নিরাশও হয় এবং সম্ভবপর কাজকেও অসম্ভব মনে করতে থাকে। কিন্তু যখন সে সত্যিকার সাহস ও ঐকান্তিক ইচ্ছা নিয়ে কাজে অগ্রসর হয়, তখন অভীষ্ট পর্যন্ত পৌঁছার জন্য স্বীয় সূক্ষ্ম চিন্তার মাধ্যমে গোপন পথ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। উদাহরণতঃ উড়ন্ত পাখীকে ইচ্ছা করলে দূরত্ব সত্ত্বেও নিচে নামিয়ে আনা যায় অথবা সমুদ্রের অতল গভীরে অবস্থানকারী মৎস্যকে উপরে তুলে আনতে চাইলে আনা যায় অথবা পাহাড় ও পর্বতের ভিতর থেকে সোনা ও রূপা আহরণ করতে চাইলে খনন করে আহরণ করা যায় অথবা বনের স্বাধীন ও মুক্ত হাতীকে ধরে পোষ মানাতে চাইলে মানানো যায়, বিষধর সাপ ও অজগরকে ধরে খেলা দেখাতে চাইলে দেখানো যায়, যদি কেউ গ্রহ-উপগ্রহের সংখ্যা ও দৈর্ঘ-প্রস্থ জানতে চায়, তবে জ্যামিতি শাস্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা জানতে পারে। মোটকথা, মানুষ দুঃসাধ্য কর্মসমূহের উপায় বের করার ব্যাপারে ওস্তাদ। সে প্রত্যেক কাজের পদ্ধতি ও তার সাজসরঞ্জাম সম্পর্কে জ্ঞান

অর্জন করতে পারে। এসব উপায় ও পদ্ধতি মানুষ কেবল পার্থিব জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে আবিষ্কার করে। সুতরাং সে যদি পারলৌকিক জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায় এবং তার সামনে একটি মাত্র কাজ থাকে অর্থাৎ অন্তরকে সোজা করা, তবে এ কাজে সে অক্ষম হবে কেন এবং এটা অসম্ভব হবে কেন? না, মানুষের সাহস ও হিম্মতের সামনে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। পূর্ববর্তী মনীষীগণ তো এ কাজে অক্ষম হননি। যারা তাদের উত্তমরূপে অনুসরণ করেছে, তারাও এ কাজে হার মানেনি। এখনও যে ব্যক্তি সত্যিকার ইচ্ছা ও অটল সাহসের অধিকারী হবে, সে কখনও অপারগ হবে না; বরং পার্থিব উপায়সমূহ আবিষ্কার করার কাজে যে পরিমাণ অধ্যবসায় ও শ্রম স্বীকার করতে হয়, তার এক-দশমাংশও এতে স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না।

বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তিনটি বিষয় মানুষের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়— বুদ্ধি, শিক্ষা ও মারেফত। বুদ্ধি এমন একটি জন্মগতভাবে প্রাপ্ত মৌলিক নূর বা আলো— যা দ্বারা মানুষ বস্তুনিচয়ের স্বরূপ উদঘাটন করতে সক্ষম। মানুষের মূল সৃষ্টিতে বুদ্ধিমত্তাও থাকে এবং নির্বুদ্ধিতাও থাকে। বুদ্ধিহীন ব্যক্তি বিভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তাই মূল সৃষ্টিতেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা থাকা জরুরী। জন্মগতভাবে এরূপ না হলে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে মূল বুদ্ধিমত্তা বিদ্যমান থাকলে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি দ্বারা তাকে শানিত করা যায়। এ থেকে জানা গেল যে, বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। তাই হাদীসে বলা হয়েছে—

تبارك الذى قسم العقل بين عباده اشتاتا - ان الرجلين
ليستوى عملهما وبرهما وصومهما وصلوتهما ولكنهما
يتفاوتان فى العقل كالذرة فى جنب احد ما قسم الله
بخلقه حظا افضل -

অর্থাৎ, মহিমান্বিত সেই আল্লাহ, যিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্নরূপে বুদ্ধিমত্তা বণ্টন করেছেন। নিশ্চয় দু'ব্যক্তির আমল তথা নামায, রোযা ইত্যাদি সমান সমান হয়। কিন্তু তাদের বুদ্ধিমত্তার একটি কণাতেও উহুদ পাহাড়সম ব্যবধান থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে বুদ্ধিমত্তার চেয়ে উত্তম বস্তু দান করেননি।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলে আকরাম (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করল— যদি কেউ দিনে রোযা রাখে, রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে, হজ্জ ও উমরা পালন করে এবং দান-খয়রাত, জেহাদ ইত্যাদি পুণ্য কাজ যথারীতি সম্পাদন করে, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে তার কি মর্তবা হবে? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ সে বুদ্ধিমত্তার মাপ অনুযায়ী সওয়াব পাবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তির প্রশংসা করা হলে তিনি শুধালেন ঃ তার বুদ্ধিমত্তা কেমন? লোকেরা বলল ঃ আমরা এবাদত, চরিত্র ও গুণ-গরিমার কথা বলছি। তিনি বললেন ঃ আগে বল তার বুদ্ধিমত্তা কেমন? কেননা, নির্বোধ ব্যক্তি নির্বুদ্ধিতার কারণে ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য ভুল করে বসে। কিয়ামতের দিন মানুষ বুদ্ধি পরিমাণেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে।

বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষার দ্বিতীয় বিষয় মারেফতের অর্থ হচ্ছে চারটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা। প্রথমত, নিজের সম্পর্কে জানতে হবে যে, সে এই পৃথিবীতে একজন অচেনা মুসাফির এবং আল্লাহর মারেফত ও দীদারই তার জন্যে উপযুক্ত। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তৃতীয়ত, দুনিয়া সম্পর্কে জানতে হবে। চতুর্থত, আখেরাত সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞানলাভ করতে হবে। আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের কারণে বান্দার অন্তরে তাঁর প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হবে। আখেরাতের জ্ঞান অর্জিত হলে তৎপ্রতি আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পাবে। দুনিয়া সম্পর্কে জ্ঞাত হলে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা ও বিমুখতা হাসিল হবে এবং তার কাছে সর্বাধিক জরুরী কাজ তাই হবে, যা আখেরাতে উপকারী। যখন আখেরাতের কাজ করার ইচ্ছা প্রবল হবে, তখন সকল বিষয়ে তার নিয়ত সঠিক হবে। ফলে, বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে।

আল্লাহর মারেফত ও নিজের সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ফলস্বরূপ যখন খোদায়ী মহব্বত প্রবল হবে, তখন তৃতীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন হবে; অর্থাৎ আল্লাহর পথ কিভাবে অতিক্রম করা উচিত, কোন্ কোন্ কাজ আল্লাহর নিকটবর্তী করে, কোন্ কোন্ কাজ আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এছাড়া পথের বিপদাপদ ও বিনাশকারী বাধাসমূহ জানা। আলোচ্য গ্রন্থে আমরা এসব বিষয় নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করছি। যেমন প্রথম খণ্ডে এবাদতের শর্ত ও বাধাবিপত্তি লিপিবদ্ধ করেছি। এসব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং বাধাবিপত্তিগুলো অতিক্রম করতে হবে। দ্বিতীয় খণ্ডে পারস্পরিক আদান-প্রদানের রহস্য এবং যেসব আদান-প্রদান অপরিহার্য, সেগুলো বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে শরীয়তের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী আমল করতে হবে। আলোচ্য খণ্ডে আল্লাহর পথের প্রতিবন্ধক বিষয়সমূহ বিধৃত হয়েছে অর্থাৎ, নিন্দনীয় স্বভাব-চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং নিন্দনীয় স্বভাবগুলো জানতে হবে এবং প্রতিকারের পন্থাও আয়ত্ত করতে হবে। এসব বিষয় জেনে নিলে বর্ণিত সকল প্রকার বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর হবে।